প্রকাশকাল : জুলাই ১৯৫৬

প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায়
ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স
৮-সি রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর শ্রীঅবনীকুমার দাস
লক্ষ্মীশ্রী মুদ্রণ-শিল্প
৪৫ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা ৯



যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ভূমিকা

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতার আলোচনায় গবেষণার স্থান নিতান্তই সংকীর্ণ। কবির কোনো নির্ভরযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয়নি। তাঁর লেখা চিঠিপত্র কোথাও সমগ্রভাবে সংরক্ষিত নেই। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত স্বনামে ও ছদ্মনামে লেখা তাঁর নানা প্রবন্ধ আমার কাছে সংগৃহীত আছে, কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। যতীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যরচনা 'প্রত্নমূলক গবেষণা', শেষ লেখা 'ছাদে প্রাদেশিকতা' ১৩৬০ সালে 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, তাঁর কোনো গদ্য রচনাতেই দুঃখবাদের ছায়া নেই। বিপ্রতীপ গুপ্ত ছদ্মনামে লেখা কৌতুকোজ্জ্বল 'স্মৃতিকথা (১৩৫৬ সালে 'মাসিক বসুমতী'র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত) ছাড়া কবির কোনো বিস্তৃত আত্মজীবনী নেই। ডায়েরী লেখার পাশ্চাত্য অভ্যাস তাঁর ছিল না। কবির স্বগ্রামে তিনি বিস্মৃত ; সেখানে বর্তমানে যাঁরা বাস করেন তাঁদের ভাষা ও আচার ভিন্ন দেশীয়। এক্ষেত্রে গবেষকদের একমাত্র উপকরণ তাঁর লেখা স্বল্পসংখ্যক কবিতা ও কিছু কিংবদন্তী। কবিতাবহির্ভূত উপকরণের এই দৈন্য বা স্বল্পতা অনেকের কাছে হতাশার কারণ হলেও এর একটা সুফল আছে। যতীন্দ্রনাথের কবিতাই তাঁর কবিতার একমাত্র পথনির্দেশক।

যতীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বেশী নয়। 'মরীচিকা' (১৩৩০), 'মরুশিখা' (১৩৩৪), 'মরুমায়া' (১৩৩৭), 'সায়ম্' (১৩৪৮) এবং 'ত্রিযামা' (১৩৫৫) কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত। 'নিশান্তিকা' (অগ্রহায়ণ ১৩৬৪) তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। 'অনুপূর্বা' কবির স্বনির্বাচিত সংকলন ; এর প্রথম প্রকাশকাল ১৩৫৩ সাল।

বাংলা কবিতার বিভিন্ন সংকলনে যতীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতা তাঁর সমগ্র কাব্যের ভূমিকা হিসাবে ভ্রান্তিকর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত

'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এ যতীন্দ্রনাথের 'ডাক হরকরা' ও 'হাট' স্থান পায়। বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'য় নির্বাচিত হয়েছে 'ঘুমের ঘোরে'-র প্রথম ঝোঁকের অংশবিশেষ, 'পাষাণ প্রতিমা' 'অপমান' ও 'সর্ষেফুল'। রবীন্দ্রনাথ ও বিষ্ণু দে অবশ্যই আমাদের কাব্যরুচির দুই বিধাতা। যতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনীহা বোঝা যায়, কিন্তু বিষ্ণু দের কবিতা নির্বাচন দেখে মনে হয় তিনি 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা' ছাড়া যতীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্যগ্রন্থ দেখেননি বা পড়েন নি। রবীন্দ্রনাথের হয়তো ধারণা ছিলো যতীন্দ্রনাথের কয়েকটি রবীন্দ্রানুগামী কবিতা বাংলা কবিতার ইতিহাসে কুণ্ঠিতভাবে বেঁচে থাকবে। 'ডাক হরকরা' কবিতায় শুধু একটি চিত্রকল্পে অভিনবত্বের ইঙ্গিত আছে।

শুধু জানি যেতে হবে সেই সেথা নদীর ওপারে
শূন্য রণভূমে
বৃদ্ধ ক্লান্ত দিবা যেথা লক্ষ নক্ষত্র-নীহারিকা হয়ে
শবশয্যা চুমে।

কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কবিই নিজের কাব্যরুচির নিগড়ে বন্দী। আমি কবি নই, কবিপুত্র। যতীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে আমারও নিজস্ব ভালোমন্দ বোধ ও পক্ষপাতিত্ব আছে। আমার মতে কবির দ্বিতীয় পর্বের রচনাই বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। তথাপি কবিতা নির্বাচনে আমি যতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্বের অধিকাংশ বিশিষ্ট কবিতাকেই স্থান দিয়েছি। যতীন্দ্রনাথের কয়েকটি জনপ্রিয় কবিতা শিথিল দুঃখচর্চার কাব্য। এরমধ্যে দু একটি সংকলনে গ্রহণ করেছি। সংকলয়িতার কাছে পাঠকেরও কিছু প্রত্যাশা থাকে।

সাধারণ পাঠকের মনে যতীন্দ্রনাথ আজও দুঃখবাদী ও মানবহিতৈষী কবিরূপে চিহ্নিত। যে সব পাঠকের বাংলা কাব্যের সঙ্গে পরিচয় পাঠ্যপুস্তক বা সংকলন গ্রন্থের বাইরে বিস্তৃত তাঁদের চোখে যতীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রমোহমুক্ত আধুনিকতার দুরূহ সম্মানে ভূষিত।

যতীন্দ্রনাথের কবিজীবন সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য হয়তো মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-এ ছাত্রাবস্থায়। তার পূর্বে কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' ও গ্রাম্য কবিগান তাঁর কিশোর কল্পনাকে স্পর্শ করে। গ্রামের নির্জন আমবাগানে একাই দ্বৈত কবির ভূমিকায় উতোর চাপানের মহড়ার কথা তাঁর মুখে শুনেছি। এ ছাড়া কিছু সংস্কৃত কাব্য এবং স্কুলে হেম-নবীনের বীররসাত্মক কাব্য তাঁর কৈশোরের সম্পদ। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় তাঁর জীবনে একটি অনাস্বাদিতপূর্ব ঘটনা। তিনি প্রথমে অভিভূত ও পরে পূর্ব অপরিচয়ের জন্য লজ্জিত বোধ করেন। অথচ তাঁর 'মরীচিকা' ও 'মরুশিখা' পর্বের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কাব্যরীতি ও জীবনদর্শনের প্রতি নানা তীক্ষ্ণ কটাক্ষ ও শ্লেষ। রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর এই প্রণয়-কলহকে অনেকে বিদ্রোহ বলে ভুল করেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরীচিকা'র মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথের একটি অল্পপরিচিত কবিতার চারটি বিস্ময়কর লাইনের উদ্ধৃতি অনেক পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন
আপনারে দিব ফাঁকি।
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজ
আমরা খাঁচার পাখী।

যে গভীর জীবনবেদনা যতীন্দ্রনাথের কবিতার একটি উৎস তার প্রকাশ তিনি রবীন্দ্রকাব্যেই পেয়েছেন। আমার মনে পড়ে. 'আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে ওগো' এই কবিতাটি যতীন্দ্রনাথের মনকে দীর্ঘদিন আবিষ্ট করে রাখে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে লেখা 'বাইশে শ্রাবণ'এ এই কবিতার আর দুটি লাইনের অভিনব প্রয়োগ আছে।

হৃদয়বন্ধু, শুন গো বন্ধু মোর —
আজি পিঞ্জর-ভুলাবারে কিছু নাহি রে।

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এই দ্বৈতভাব জয়ন্তী-উৎসবে রচিত 'রবিপ্রণাম' কবিতায় পরিস্ফুট।

আমরা নীচের পাখী,
এ পাখা বিধির ফাঁকি,
আকাশের সংবাদ না পাই,
ঘটিছে যা লোকে লোকে
ছায়া পড়ে তব চোখে,
তাই বন্ধু তোমারে শুধাই—
দিক হতে ঘুরে দিক
তুমি কি জেনেছ ঠিক
এ জীবন নহে মরীচিকা ?

ঈশ্বরকে 'বন্ধু' সম্বোধনেও কবির এই দ্বৈত মনোভাব। ভগবান তাঁর অন্বিষ্ট ; কিন্তু তাঁর গভীর দুঃখচেতনা ও জীবনবোধ ভক্তি বা জ্ঞানমার্গে ঈশ্বরের সন্ধান পায় না। তাই প্রেমমার্গে তাঁর ঈশ্বর অন্বেষণ। তাই যতীন্দ্রকাব্যে ভগবানের এতো নিগ্রহ। মৃত্যুর তিন-চারদিন পূর্বে এক মেঘল' সকালে তাঁর মুখে 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' গানটি গুঞ্জরিত হতে শুনেছি। 'বন্ধু'র স্মরণে রবীন্দ্রনাথের গান।

'মরীচিকা'য় প্রকাশিত 'মন-কবি' কবিতাটি বাংলার কাব্যক্ষেত্রে কাব্যিকতার বিরুদ্ধে বোধ হয় প্রথম প্রতিবাদ।

কাব্যবিহীন মন-কবিরে।
ডুবে' থাক এই ডোবা গভীরে।

* * * * * *

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে ;

—ইত্যাদি লাইন সে যুগে একাধিক কারণে চমক সৃষ্টি করে। বঙ্গবাণীর যাঁরা সনাতন সেবক তাঁদের হাতের স্পর্শ অতিশয় কোমল, কিন্তু এই নতুন কবির করস্পর্শে মা চম্‌কে উঠলেন। ইঙ্গিত অতিশয় তীক্ষ্ণ। 'মিথ্যে মিষ্টি কথা'র বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদের সাময়িক প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ও ভাষা তাঁর পরবর্তী কবিদের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়েছিল।

কবিতার চরিত্রের মুক্তি আসে ভাষার পথে ; এর প্রমাণ সব দেশের সাহিত্যেই আছে। যতীন্দ্রনাথ এই অর্থে বাংলা কবিতাকে মুক্তি দিয়েছেন।

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে,
মামুলি প্রেমের নেট-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল মশারির নেই আদি
অনন্ত, অমধ্য,অভেদ্য ইত্যাদি।

উপমা ও ভাষাপ্রয়োগের এই সাহস দ্রষ্টব্য। কবিতাটি লঘু ব্যঙ্গরচনা নয়। এর পেছনে এক নতুন উপলব্ধি ক্রিয়াশীল।

যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ধারণা, 'মরীচিকা' 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া' অর্থাৎ প্রথম পর্বের কবিতা দুঃখচেতনায় প্রখর এবং সনাতন অধ্যাত্মচিন্তা ও ঈশ্বরবাদের অস্বীকারে নির্ভীক। এই পর্বেই তিনি 'আধুনিক' এবং 'সায়ম্' 'ত্রিযামা' ও 'নিশান্তিকা'র কবিতায় এই আধুনিকতার পশ্চাদপসরণ। 'মরীচিকা'য় প্রকাশিত 'ঘুমের ঘোরে' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। এই কবিতার বহু লাইন কল্লোলযুগে প্রবচনের মত ব্যবহৃত হয়েছে।

মরণে কে হবে সাথী।
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।

* * *

তুমি শালগ্রাম শিলা :
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।

* * *

চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে ?

* * *

কল্পনা, তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে' লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস !

এ কবিতার ঈশ্বরজিজ্ঞাসা একটি আদিম প্রশ্ন। কিন্তু 'ঘুমের ঘোরে'র চমৎকারিত্ব শুধু এই জিজ্ঞাসা বা সমাধানে নয়। সপ্তম ঝোঁকে সমাপ্ত এই কবিতার নির্মাণকৌশল কবির একান্তভাবেই নিজস্ব উদ্ভাবন। কাব্যিক ব্যঞ্জনাবর্জিত উপমা ও শব্দের প্রয়োগ, শুধু অনুভূতির তীব্রতায় ভাষার শক্তিসঞ্চার এবং সর্বোপরি কৌতুক ও অনুভূতির এমন বিচিত্র সমন্বয় বাংলা কাব্যে অভূতপূর্ব।

ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত---

নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ ত।

'ঘুমের ঘোরে' কবির বন্ধু নিদ্রাহীন রজনীতে তাঁর অদৃশ্য বন্ধুর সঙ্গে এক বিচিত্র কবির লড়াই। তাঁর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে লেখা কবিতা 'পরাভব' এ ভিন্ন স্বরে একই অভিমান।

এ যে মরণের ভ্রূকুটি-ভয়াল
মুখোশ আঁটিয়া মুখে।
চিরজীবনের বন্ধু আমার
দাঁড়াইলে পথ রুখে।

* * *

দীর্ঘ দুখের পসরা মাথায়
জরাভারে দেহ কাঁপে,
হে নওজোয়ান এখন এসেছ
শক্তির পরিমাপে।

তাঁর শেষ লেখা কবিতা 'আসছে জন্মে'। কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি।

এবারের মতো মনিষ্যি হয়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।

সুতরাং সব চেপেই যাই,

রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাও।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন এই বন্ধুবরের প্রাণান্ত সন্ধান। তাঁর সামগ্রিক দুঃখচেতনা মাঝে মাঝে দুঃখবাদের মুখোশ ধারণ করে বাংলাদেশের অলস পাঠককে বিভ্রান্ত করেছে। কবি নিজেও এর জন্যে আংশিকভাবে দায়ী।

হাটে হাটে আমি ঘুরে যে বেড়াই
সে নহে এ রূপে হাট
হাটের বক্ষে দেখে যাই আমি
কত যে কাঁদিছে মাঠ।

এ কবিতা sentimental। এখানে তিনি দুঃখবাদী এবং তাঁর মন অলস। যে সব কবিতার জন্য যতীন্দ্রনাথ স্মরণীয় 'হাটে' অবশ্যই তার মধ্যে স্থান পাবে না। তবে দুঃখচেতনার সুন্দর প্রকাশ 'কচিডাব' কবিতায়।

শীতাতপে দিগম্বর
দিশাহীন পথচর
দেহ চলে ক্ষুধার নেশায়,
অন্তর শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা।
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা।
কৃষ্ণা চতুর্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা।

এই তার আরাধ্য দুঃখমূর্তি। 'অস্ত গেছে শেষ শশীকলা' চিত্রে যে মাধুর্য আছে তা অবশ্যই দুঃখবাদের লক্ষণ নয়। তাঁর প্রথম যুগের

কবিতায় এই দুঃখবোধ যে মাঝে মাঝে মুদ্রাদোষের মত মনে হয় তার কারণ জীবনের দুঃখচেতনা তখনও অগভীর। শেষবয়সে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ভঙ্গীর বন্ধনমুক্ত হয়ে দৃষ্টিতে পরিণত। তাই দুঃখচেতনা আরও গভীর এবং প্রকাশ আরও সংযত ও মর্মভেদী। 'নিশান্তিকা'য় প্রকাশিত 'সুখ ভোগ' থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করি।

হয়তো পুণ্য ছিল কোন কালে—
সঘৃত অন্ন লিখিলে কপালে,
জুটে নিয়মিত সন্ধ্যা সকালে
ধোঁয়ানো দুধের বাটি!
সে ঘৃতান্নের প্রতি গ্রাসে গ্রাসে
যত নিরন্ন মুখ মনে আসে,
চুমুকে চুমুকে দুধের ছেলের
ক্ষুধার কান্নাকাটি।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যকৌশলের অভিনবত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে। স্বল্পপরিসর ভূমিকায় আমি একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রবো। 'সায়ম্' এ প্রকাশিত 'চিরবৈশাখ' একটি আশ্চর্য কবিতা। এবং এর ভঙ্গী বিশেষভাবে যতীন্দ্রনাথের নিজস্ব। বৈশাখ প্রায় অতিক্রান্ত। কবি অফিসে গিয়ে শোনেন সেদিন ছুটি। নিতান্ত ঘরোয়া কথায় গল্প বলার ভঙ্গীতে কবিতাটি সুরু। 'প্রাণের পরনে শিথিল এ দেহ খসিয়া পড়িতে চায়'—অভিনব metaphor; কিন্তু কবিতার উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ গতি এখনও অস্পষ্ট। কয়েক লাইন পরেই কবিতার আকস্মিক সুরবদল। এই নাটকীয়তা, লঘু পরিহাসের ভঙ্গী থেকে উদ্দীপ্ত, বেগময় ও বহুতন্ত্রী ভাষায় কবিতার রূপান্তর—বাংলা কাব্যে এটি নতুন স্বাদ। 'কচি ডাব' কবিতাতেও এই নাটকীয় আকস্মিকতা ও সুরবদল। বর্তমান যুগে যতীন্দ্রনাথের আধুনিকতা তাঁর ঈশ্বর অন্বেষণ বা দুঃখচেতনায় নয়। তাঁর কাব্যকৌশল ও ভাষা প্রয়োগে।

'মরীচিকা' গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতার পূর্বে কবির কয়েকটি অপ্রকাশিত

কবিতার পাণ্ডুলিপি আমার কাছে আছে। কবিতাগুলি নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন। ভাষা, প্রকাশভঙ্গী বা দৃষ্টিতে 'মরীচিকা'র কবির কোনো আভাস এখানে নেই। একটি নমুনা দিলাম।

হে দেবি! আমার হৃদে
আপনি আসিয়া।
মিলনের শ্যামশয্যা
দেহ বিছাইয়া।
রচ গো নিভৃত কুঞ্জ
আপন সঙ্গীতে
তার পরে ডাক মোরে
আহ্বানে ইঙ্গিতে।

কবিতাগুলির রচনাকালের স্পষ্ট উল্লেখ নেই। মনে হয় ১৩১৮-১৫ সালের মধ্যে রচনা। 'মরীচিকা'র কবিতারচনার আরম্ভকাল ১৩১৭ সাল। সময়ের এই স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে দৃষ্টি ও ভাষায় স্বতন্ত্র যে বলিষ্ঠ চরিত্রবান কবিতার জন্ম হ'লো এর কোনো ব্যাখ্যা হয়তো নেই। সমসাময়িক কবিতাকে 'মরীচিকা'র কবি কি চোখে দেখেছিলেন তার দৃষ্টান্তস্বরূপ যতীন্দ্রনাথের লেখা একটি ব্যঙ্গরচনার অংশ উদ্ধৃত করছি। "কবিরাজ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত মহাশয় কাব্য-কালান্তক রস আবিষ্কার করিয়া 'যমুনা'য় কিছুকাল আগে এক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। বুকজ্বালা, মন হু হু করা, চোখে ঝাপ্‌সা দেখা, প্রাণ কেমন করা, রাত্রে নিদ্রা না আসা, পেট ফাঁপা, মাঝে মাঝে হাত শুড় শুড় করা ইত্যাদি উপসর্গ এক বটিকা সেবনেই উপশমিত হইবে। বিশেষ চেষ্টায় বেতস, বিছুটি প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কয়েকটি দেশীয় গাছ গাছড়ায় এই মহৌষধ প্রস্তুত। পথ্যের কোন ধরাকাট নাই। কেবল ঔষধ ব্যবহারের সময় ও পরে একমাস জ্যোৎস্না লাগান, ফুল শোকা এবং মাসিকের সম্পাদকের সহিত পত্রবিনিময় নিষিদ্ধ।"

কবিতা যে একটি সচেতন শিল্পকর্ম এ বিষয়ে যতীন্দ্রনাথের স্পষ্ট

মতামতের পরিচয় পাই 'কাব্যপরিমিতি' গ্রন্থে। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর সচেতন অধ্যবসায়ের উল্লেখ আছে। "যথেষ্ট শক্তির অভাবে কবিতা লিখতে আমি যে পরিশ্রম করি তা বোধ হয় বিশ্বাস করা যায় না। প্রতি কথায় সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আনবার জন্য আমার অধ্যবসায়ের অন্ত নেই…একটি কবিতা লিখতে আমার ১ সপ্তাহ থেকে ২ সপ্তাহ লাগে, আর প্রতিদিন অন্ততঃ ৪ | ৫ ঘণ্টা তাই নিয়ে থাকি। সমস্তক্ষণ নিম্নস্বরে ছত্রগুলি গান করে অদল বদল যোগ বিয়োগ করি…। শেষে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি তখন তাকে ছাড়ান দিই। তারপরও তাকে ছাপাখানায় দিই না; ৬ মাস ১ বছর ফেলে রাখি অধিকাংশ ক্ষেত্রে।"

এই সংকলনকর্ম আরম্ভ করার আগে যতীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বিভিন্ন পাঠক ও সমালোচকের প্রকাশিত লেখা আমি নতুন করে পড়েছি। ভিন্ন রুচির সমালোচকেরা কবিকে কি দৃষ্টিতে দেখেছেন সংকলয়িতার সে ব্যাপারে অবহিত হওয়া দরকার। মানুষ যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু কিছু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ভবিষ্যতে যদি কেউ যতীন্দ্রনাথের জীবনী লেখেন তিনি অবশ্যই তথ্যের সঙ্গে কিংবদন্তীর উপাদেয় জগাখিচুড়ী তৈরী করবেন না। 'হোমশিখা' পত্রিকায় প্রকাশিত (ফাল্গুন ১৩৬১) অজিত দাশের 'একটি স্মরণীয় দুপুর' দ্বিতীয়বার যত্ন করে পড়েছি। আমার পরিচিত কবির সঙ্গে অজিত দাশের প্রগল্‌ভ যতীন্দ্রনাথের কোন মিল নেই। লেখাটি বোধ হয় ব্যঙ্গরচনা। শশিভূষণ দাশগুপ্তের লেখা 'কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' যতীন্দ্রনাথের কবিতার বোধ হয় শ্রেষ্ঠ ভূমিকা। অমরেন্দ্র গণাই-এর সম্প্রতি প্রকাশিত 'যতীন্দ্রনাথের কবিকৃতি' গ্রন্থে তথ্যনিষ্ঠার সঙ্গে সমালোচকের সামগ্রিক দৃষ্টির পরিচয় আছে। 'নিশান্তিকা'র সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত যতীন্দ্রনাথের দুই পর্বের কবিতার ভিন্ন সুর ও ভঙ্গীর আলোচনা করে পরিশেষে বলেছেন, কবির দৃষ্টি যখন রুদ্রের বামাস্য ছেড়ে প্রসন্ন দক্ষিণ মুখের ওপর পড়ল তখন তাঁর কবিতায় 'নানা রস ও বহু রং'। অতুল গুপ্তের পক্ষপাতিত্ব এই

সুরবদলের কবিতার প্রতি। যতীন্দ্রনাথের কাব্যে এই সুরপরিবর্তনের নিঃসংশয় নিদর্শন তাঁর দুই পর্বের কবিতায় চিত্রকল্প প্রয়োগে। প্রথম পর্বের রচনা 'কবির কাব্য' কবিতায় তাঁর চোখে দিনান্তের চিত্র —

দিনান্তে যবে ব্যর্থ সে রবি অস্তশিখর 'পরে,
ছেঁড়া মেঘে পাতি' মৃত্যুশয়ন রক্ত-বমন করে।

দ্বিতীয় পর্বে লেখা 'রূপ কোথা আছে' কবিতায় শারদসপ্তমীর রজনীর চিত্র—

আকাশের পেটিকা খুলিয়া
রংচটা বুটি-ওঠা জীর্ণ নীল সাটি
সাবধানে আঁটি অঙ্গে
চলিয়াছে প্রৌঢ়া রাত্রি প্রতিমাদর্শনে।

অধ্যাপক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী। তাঁরই উৎসাহে এই সংকলনকার্যে আমি প্রবৃত্ত হয়েছি। অধ্যাপক সুহাস কুমার বিশ্বাস আমার অক্ষমতার কথা ভেবে স্বেচ্ছায় এই সংকলনের প্রেসকপি সযত্নে লিখেছেন। কবিতা নির্বাচনে অধ্যাপক অমরেন্দ্র গণাই আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

সুনীল কান্তি সেন

সূচীপত্র

প্রথম পংক্তির সূচী

বহ্নিস্তুতি

তপন তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপে বহ্নি !
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।
রক্তবসন, ভস্মআসন, বিশ্বশাসন জ্যোতি,
কান্ত ভয়াল, আঁধারের আলো, তোমায় করি গো নতি।
শিখায় শিখায় হেরি তব রূপ, রূপে রূপে তব শিখা,
তৃষিত মরুর নীরস অধরে তুমি ধর মরীচিকা।
নিখিল বিশ্বে খুঁজে' ফিরি' তোমা যত পতঙ্গ সবে,
হে বৈশ্বানর, অবিনশ্বর ভস্মে শান্তি লভে।
বিদ্যুতে তব ইঙ্গিত ঝলে, বজ্রে জাগিছে বাণী,
মানব চিত্তে, আণব নৃত্যে তোমারি সে টানাটানি।
বুকে বুকে আর জঠরে জঠরে তোমারি কঠোর দাহ,
প্রাণ হ'তে প্রাণে প্রণয়তন্ত্রী, তোমারি সে পরিবাহ।
জীবনে কি বনে, মাঝে মাঝে তুমি জ্বলে' উঠ দাবানলে,
বক্ষে চক্ষে পেতেছ আসন তৃষ্ণার শতদলে !
ধুক্‌ধুক্‌ এই হৃদিমূলে তব ধিকিধিকি কৌতুক,
সাগরে ডুবে'ও দগ্ধগিরির সমান দহিছে বুক।
শনির আঁখিতে তোমারি দৃষ্টি নিয়ত হানিছে শ্লেষ :
অনাবৃষ্টিতে শুষিয়া জ্যৈষ্ঠে, ভাদ্রে ডুবাও দেশ।
দুর্ঘট মিল তুমিই মিলাও লোহায় লোহায় জুড়ে' ;
চিতার ফুলকি উড়ে' লাগে পুনঃ চিত্তের জতুপুরে !
দুর্দিনে তোমা সাধিয়া জ্বালাই সুদিনের সঞ্চয়ে,
সব সম্বল ভস্ম করিয়া উঠ যে দীপ্ত হয়ে।

আজ ভাবিতেছি তাই—
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই।
মিলন বিরহ ভাব ও অভাব যোগবিয়োগের কাজ,
থেমে গিয়ে যবে এ বিশ্ব হবে ভস্মের মহাতাজ,
বিভূতিভূষণ শঙ্কর একা রহিবেন যেই কালে,
তখনো কি তুমি আপন জ্বালায় জ্বলিবে তাঁহারি ভালে;
হে সর্ব্বভুক্ এ দীন শর্মার লক্ষ প্রণাম লহ,
কঠিন শীতল অন্তর তাব আশিস দাহনে দহ।

ঘুমের ঘোরে

প্রথম ঝোঁক

এস ত বন্ধু, আবার আজিকে বেড়েছে বুকের ব্যথা ;
তোমায় আমায় হয়ে যাক দু'টো কাটাছাঁটা সোজা কথা ।
জগৎ একটা হেঁয়ালি—

যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খাম খেয়ালি !
পৃথিবী ঘুরিছে বেমালুম যেন মাখম-মাখান পথে,
ছোট বড় কত টানে অবিরত টলে না সে কোন মতে ।
সৃষ্টি চমৎকার—

ঠোকাঠুকি নাই, গতি-বিজ্ঞানে বাঁধা আছে চারিধার ।
সে দিন বন্ধু, পথে পড়েছিনু, ছুটাইলে তুমি ঘোড়া,
লোহা বাঁধা তার পদাঘাতে মোর ঠ্যাংটি হইল খোঁড়া !
দেখি চলিবার কালে,
গতি-বিজ্ঞানে লেখা নাই তবু খোঁড়া ঠ্যাংই পড়ে খালে ।

সেদিন আবার টেনে নিয়ে গেলে ভক্তের সভাতলে,
"ঠাকুরের, আহা ! অপার করুণা" কেঁদে কেঁদে তারা বলে ;
"দেখিছ যেটারে দুঃখ—

ঠাওর করিয়া দেখ—সেটা সুখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম ।"
ঠাওর করিতে দুখ সুখ হ'ল, সুখ হয়ে গেল দুখ,
মোটের উপরে বুঝিতে নারিনু লাভ হ'ল কতটুক্ !
একাকী ফিরিনু ঘরে,
প্রাণের দুঃখ যায় না কিছুতে, আঁখি আসে জলে ভরে' ।

ঘুমের আড়ালে এলে তুমি ধীরে কহিলে হরিয়া জ্ঞান,
"প্রাণের দুঃখ না যাক্ কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।"
বন্ধু প্রণাম হই,
শীতের বাতাসে জমে' যায় দেহ—ছেঁড়া কাঁথাখানা কই?

শান্ত রাত্রি, জ্যোৎস্না শীতল, বনভূমি নিঃঝুম,
সেই পথ দিয়ে আমার চক্ষে আসুক গভীর ঘুম!
সেই জুড়াবার ঠাঁই·
কঠিন সৃষ্টি ধোঁয়া হয়ে আসে কোথা কিছু বাধা নাই।
যুগ যুগ ধরে' কেন এ প্রয়াস গরমিলে মিলাইতে!
কোন যম নাই হিসাব করিয়া সুখ ও দুঃখ দিতে।
মুক্তির চাবি আঁটা,
এ জগৎ মাঝে সেই তত সুখী, যার গায়ে যত ঘাঁটা!
বন্ধু গো, আমি জানি হেথা চির ভোটহীন অধীনতা,
নিরুপায় হয়ে কেহ বলে তোমা পিতা, কেহ বলে মাতা!
আমি বলি, কিনে' কুলো-
পিঠে বেঁধে, দাও গভীর নিদ্রা দু'কাণে গুঁজিয়া তুলো।

কেন ভাই রবি, বিরক্ত কর? তুমি দেখি সব ওঁচা
কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মারো খোঁচা!
জানি তুমি ভাল ছেলে,
ঘড়িটি তোমার কাঁটায় কাঁটায় ঠিক যায় বিনা তেলে!
তব জয় জয় চারিদিকে হয়, আলোক পাইল লোক,
শুধাই তোমায় কি আলো পেয়েছে জন্মান্ধের চোখ?
চেরাপুঞ্জির থেকে,
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?
সবার খাদ্য প্রতিদিন তুমি বহি' আন ডালা ভরি';
ক্ষুধিত মানব কেঁদে বলে "তাঁর অপার করুণা, মরি।"
ক্ষুধা দিয়ে দেওয়া অন্ন,

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

"গরু মেরে জুতো দান" অপেক্ষা নহে কভু বেশী পুণ্য !

প্রভাতে উঠিয়া বাহির হ নু সিক্ত গ্রাম্য পথে.
ঘুম ভেঙেছিল, এমন শপথ করিব না কোন মতে !
ছেলেরা লাট্টু খেলে,
লেতিতে জড়ায়ে মুঠায় ঘুরায়ে বোঁও করে ছুঁড়ে ফেলে ।
বন্-বন্-বন- ঘুর-ঘুর-পাক চিতেন কেতেন সোজা ;
লাট্টু বলিছে, "হায় হায় হায় ! ঘুরে' ঘুরে' কারে খোঁজা !
জীবন যে আসে ফুরায়ে"—
বলিতে বলিতে ফুরাল ঘুরন—বালক লইল কুড়ায়ে ।
আবার লেতিতে জড়ায়ে লাট্টু গপ্‌চা মারিয়া ফেলে,
একটার ঘায়ে অন্যে ফাটায়ে ছেলেরা লাট্টু খেলে ।
দেখিনু দাঁড়ায়ে কোণে,
ফাটা লাট্টুটা ছুঁড়ে' ফেলে দিল দূরে কণ্টক বনে ।

বন্ধু, এখনো ঘুম দাও, নহে কহিব অনেক কথা,
অনেকের 'পরে হইবে সেটা যে কঠোর নির্ম্মমতা ;
ঈশা, মুশা আর বুদ্ধ,
কনফুসিয়াস মহম্মদ বা কৃষ্ণ নিমাই শুদ্ধ,
সবাই বলেছে, পাঠালেন মোরে নিজে তিনি ভগবান ;
তোমাদের তরে প্রাণ কাঁদে তাঁর—তোমাদেরি তিনি চান ;
উপায় পেয়েছি মুখ্য,—
রবে না নরের জরা ব্যাধি শোক পাপ তাপ আদি দুঃখ :
যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িল না একচুল ,
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল !
কি হবে কথার ছলে ?
ভগবান চান—তবু হয় না'ক, একথা পাগলে বলে !
বড় কৃতজ্ঞ রব তোমা কাছে, হৃদয়-বন্ধু মোর,
চিরতরে যদি বুলাও নয়নে বিস্মৃতি ঘুমঘোর !

থাক্ বা না থাক্ স্রষ্টা—
নিখিল বিশ্ব ঘুরে' ঘুরে' মরে, তুমি তার চির দ্রষ্টা।
ঘুরনের পাকে কেউ কাছে থাকে, কেউ চলে' যায় দূরে,
তব আনন্দ রয়েছে কেবল তোমারই হৃদয় জুড়ে'।
অনিমেষ আঁখি 'পরে
তোমার অশ্রু তোমার হাস্য নহে সে মোদের তরে।
মোরা ভুল করে' প্রণাম তোমায়, ভুল করে' করি রোষ,
তোমার তাহাতে নাহি আনন্দ নাহিক অসন্তোষ।
আমরা তোমায় ডাকি,—
যন্ত্রণা পাই সান্ত্বনা চাই—আপনারে দিই ফাঁকি!

আমরা যখন সুখে সুখী হই—সে নহে তোমার দান,
তোমার বিধান নহে যে—আমরা দুখে হই ম্রিয়মাণ।
কেন যে এসব আছে,
সে কৈফিয়ৎ তুমি কোনদিন দেবে না কাহারও কাছে।
সাগরের কূলে পুরী তব, দারু-মূরতি জগন্নাথ ;—
রথের চাকায় লোক পিষে' যায়, তোমার নাহিক হাত।
তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা!
ছুটেছে তোমার মৃত্যুতিলক মুক্ত যজ্ঞ-ঘোড়া ;
মোদেরি পাকান প্রেমের দড়িতে বাঁধিতে চলেছি মোরা।
ছিন্ন গিঁঠান' দড়ি ;
তারি সাহায্যে বাসনা—তোমার যজ্ঞ-অশ্ব ধরি!

বন্ধু, আমার হৃদয়-বন্ধু, তবু তোমা ভালোবাসি ;
স্বপ্নবিহীন ঘুমের আড়ালে তুমি দেখা দাও আসি'।
তখন তোমাতে থাকি,
বিয়ের বাজনা মরার কান্না মিছে করে ডাকাডাকি ;

শান্ত তখন শ্রান্ত হৃদয়, ক্ষান্ত তখন মন,
নাহি আশা প্রেম নাহি আশংকা সাঙ্গ সকল রণ।
মরণে কে হবে সাথী.
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাত্তি !
প্রেমে ও ধর্মে নাহি প্রয়োজন--বলিনে আমি এ কথা,
মিথ্যামাত্র বৃথা নহে যদি ঘুচে তাহে কারো ব্যথা।
অসীম জড়ের মাঝে
চেতনা শক্তি--ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো রাজে।

শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায় :
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তি পানে ধায়।
বন্ধু, বন্ধুবর !
সকল শক্তি সংহত করে' হয়ে আছ মহাজড়।
সেই মহাঘুমে সাঁতারি বেড়াই মোরা স্বপ্নের ফেনা ;
পলকে ফুটিয়া মিছে ঘাড়ে করি তোমারি প্রেমের দেনা।
জগতের শৃঙ্খলা,--
স্বপ্নেরি মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়ে মেলা !
বিচারে যখন ভিতরে ভিতরে ধরা পড়ে লাখো ফাঁকি.
তোমার সে ত্রুটি নিরুপায় হয়ে প্রেমের আড়ালে ঢাকি।
প্রেম বলে' কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

দ্বিতীয় ঝোঁক

আজি দুর্দিনে ঝড়ে.
তোমায় আমায় দেখা গো বন্ধু, পুনঃ বহুদিন পরে।
জলদগর্জে ভাঙালে নিদ্রা বিদ্যুতে ধাঁধি' আঁখি,
শোন মোর কথা—ওসবের আমি তোয়াক্কা নাহি রাখি !

হান বর্ষার জল,
নিরন্ধ্র মেঘে ঘেরিয়া বজ্রে ভেঙে ফেল ধরাতল।
ও তর্জনের অর্থ বুঝিতে হয় না আমার ক্লেশ ;
আমি বেশ জানি—সুখ ও দুঃখ জীবনে দুটাই শ্লেষ !
জোড় করি দুটি কর,
মাগিব না আমি তুষ্টি তোমার যতই বহুক ঝড়।
আমাদের কাছে তুমিও যে কিছু চাহ না, সে জানি আমি ;
আপন খেয়ালে ঢালিয়া বর্ষা আপনিই যাবে থামি।

এ ধরা গোরস্থান ;—
মরণের ভিতে স্মরণের ঢিপি দু'দিনে ভূমি-সমান !
কত না অশ্রু কত হা-হুতাশ কত হাতে পায়ে ধরা,
শ্রান্ত হইয়া শান্তি লভিতে কত না ফন্দি করা।
সব হয়ে যায় বৃথা,
আসে, হাসে, কাঁদে, চলে যায় ঘুরে বায়স্কোপের ফিতা !
আমারি মতন এসেছে হেসেছে কেঁদেছে কত না প্রাণী,
আজ তাহাদের একটিরও কেহ সন্ধান নাহি জানি।
আমারও দুঃখ সুখ,
ধূলা হয়ে যাবে—চাহি বা না চাহি তোমার পাষাণ মুখ।
তোমারে নাহিক দুষি ;
নিজ ধন নিয়ে পারো করিবারে যখন যা তব খুসি।
একটি নিয়ম মান তুমি, সেটি কোন নিয়ম না রাখা ;
আঁখি মুদে' দেখি, পাগলের মত ঘুরিছে কালের চাকা !

যে দিকেই আমি যাই—
তার সাথে দেখা হবে পথে একা সহসা মরণ ঠাঁই !
অতঃপর যে কি হবে তা নিয়ে নাহিক চিন্তা লেশ,
সহজ সত্য আমার পক্ষে ইহকালেরই সে শেষ ;

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

চাহিনা প্যাঁচাল যুক্তি—
অদৃষ্টসাথে উপায়-হীনের নিত্য নূতন চুক্তি !
পূর্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না ত প্রয়োজন.
পরকালেতেও যা হবে তা হবে— কেন বৃথা আয়োজন
মিছে দিন যায় বয়ে :
উপরে ও নীচে ঘুমের তুলসী—শুই শালগ্রাম হয়ে !
বন্ধু আমার, সব নিয়ে দাও তোফা ঘুম দিনে-রেতে
নাকের বদলে নরুণ যে পায়—ব্যবসায় সেই জেতে ।

বন্ধু, ত্বরিত যাও
ঘুম পাড়ানিয়া মাসিপিসিদের মোর পাশে ডেকে দাও ।
তন্দ্রিত চোখে দেখিতেছি তব স্বরূপ খোলস ছাড়া—
দেবতা গড়িলে পাষাণে আর সে ঢালে না নিঝর ধারা :
চিতার বহ্নি যত বিধবার সিঁথার সিঁদুর চেটে.
বিশ্বম্ভর হে গণেশবর যোগায় তোমারি পেটে ।
গরু-পোষাণির প্রায়—
জননীর কোলে ছেলে বড় করে' কে পুনঃ কাড়িছে. হায় !
ব্যাপার দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া জ্ঞানী পরিহরে শোক.
দেঁতো হেসে বলে. ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হোক .
অস্য অর্থটি—
যাহার পাঁঠা সে যেদিকে কাটুক্, তাতে অপরের কি ?
ছোলা কলা খেয়ে সন্ধিক্ষণে এককোপে বলিদান—
পাঁঠার মধ্যে সে পাঁঠাটি—আহা কত না ভাগ্যবান্ !
পাঁঠার দুঃখ সুখ—
মার পায়ে দিতে নূতন সরায় রক্তে জমায়ে থুক !

চারিদিক দেখে' চারি দিকে ঠেকে' বুঝিয়াছি আমি তাই,
নাকে শাঁখ বেঁধে ঘুম দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নাই ।

যদি বল তুমি, সুখদুখ নাই—দুটাই মনের ভ্রম,
এও তবে এই ঘুমেরি একটা আফিং মিশানো ক্রম !
জারি কর তবে খ্যাতি,
এ ভব-রোগের নব চিকিৎসা আমার "ঘুমিওপ্যাথি" !
ঝুম্ ঝুম্ নিঃঝুম—
মেঘের উপরে মেঘ জমে' আয়—ঘুমের উপরে ঘুম !
ঝিম্ ঝিম্ নিশ্চিন্ত—
নাকের ডগায় মশাটা মশাই আস্তে উড়িয়ে দিন্ত ।
রিম্ রিম্ ঝিম্ ঝিম্—
পাকে পাকে কসে কিসের বাঁধন সাপের মতন হিম !
ঘর্ ঘর্ শাঁই শাঁই,
আর ভয় নাই নাই ,
আধারের ঢেউয়ে ঐ ভেসে এল জমাট ঘুমের চাঁই !
নাই উঁচুনীচু নাই আগু পিছু—
নাই সুখ দুখ আলো কালো কিছু ;
নিতল হইয়া ডুবে' নেমে যাই —দাঁড়াবার নাই ঠাঁই ।
ডা'নে বাঁয়ে মোর ব্যাস বাল্মীকি
ছেড়ে বকাবকি মিছে লেখালেখি,
সব সাধনার অন্তে বুঝেছে ঘুম পদার্থটি কি !
কেন আর গোলমাল ?
বন্ধু, এবার বন্ধ হ'ল কি বুকের কামারশাল !
চির নীরবতা চাই—
দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিওনা ভাই !

তৃতীয় ঝোঁক

আজিকে সুখের দিনে,
তোমার দুয়ারে এসেছি বন্ধু, স্বপ্নের পথ চিনে' ।

পথের দু'ধারে দুলিছে দোখনু ঘনছায়া তরুশ্রেণী,
এলায়ে দিয়েছে পিঠের উপরে পুষ্পিত লতাবেণী :
পিক পাপিয়ার দল
হৃদয়-মাতান' মধু সঙ্গীতে ভরে অম্বরতল।
খেয়ালের বশে কুড়াইনু ধূলি, হল সে সোনার কুচি,
ক্ষুধা না পেতেই কোথা হ'তে এল গরম ফুল্‌কো লুচি !
এ হেন সুখের দিনে
খোস খবরটা শুনাব কাহারে বন্ধু গো তোমা বিনে ?
আজিকার শুভরাতে
বন্দ হইব পরিণয়-ডোরে সৌভাগ্যের সাথে।

আমার প্রাসাদে জ্বালাও লক্ষ নক্ষত্রের বাতি,
রাহুকে বল'—সে গিলুক সূর্য্যে, না কাটে যেন এ রাতি।
বজ্র বাঁকায়ে মেঘের মুকুট পরাও প্রিয়ার শিরে,
কণ্ঠের হার রচগো তাহার তড়িতের তার ছিঁড়ে।
পুরাও প্রিয়ার আশ,
রামধনু দিয়ে জ্যোৎস্না ধুনিয়ে রচ তাহে রাঙা বাস।
সোহাগে গলিয়া অঙ্গে ঢলিয়া প্রিয়া কানে কানে বলে,
তোমাতে আমাতে বন্ধ হইনু অক্ষয় শৃঙ্খলে।
বন্ধু, ভুলিনি আমি—
পবন করিছে ব্যজন তবুও ললাট উঠে যে ঘামি'।

কোথা হ'তে তুমি এলে গো লক্ষ্মি ! কোথা ছিলে এতদিন !
আমার প্রমোদ-ভবনের তরে কারা হ'ল ভিটা-হীন ?
আমার দীপালি রাতি,
উজ্জ্বল আজি কত না জীবের নিবায়ে জীবন বাতি !
অশ্রু-সাগরে শোভে সহস্র নয়ন কমলদল,
তারি 'পরে ওই রেখেছ তোমার রক্ত চরণ-তল !

তব প্রসন্ন আঁখির আলোকে আমার পিছন ভরি'
যে ছায়া পড়েছে, তাহাতে লুকায় কত শোক বিভাবরী !
ভরেছ আতর-দানি,
কত প্রভাতের আধ-ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি' ছানি' ?
কণ্ঠে দুলালে মিলন-মালিকা নব সুগন্ধ ঢালা—
সদ্যছিন্ন শিশু কুসুমের কচি মুন্ডের মালা !

মিটেছে সকল আশা—
দিয়েছি নিয়েছি হরেক রকম সুখ দুখ ভালবাসা ।
ফুরায়েছে সব অশ্রু ও হাসি, জুড়ায়েছে বহুজ্বালা,
আর কেন বৃথা কাঁর বক্তৃতা এ যে বারোয়ারিতলা !
প্রকান্ড ধরা ভাড়াটে'মহল—মরণ আদায়কারী,
পলে পলে তার চোখরাঙানিতে জীবন যাপিতে নারি ।
সহে না এ বেঁচে থাকা—
বাপ পিতাম'র মামুলি ধরনে প্রতিদিন মরে' রাখা !
মরণও, সে যদি এইরূপই হয় তিলে তিলে বেঁচে যাওয়া !
অন্ত কোথায় ভেবে হাসি পায়,—এল কি ঘুমের হাওয়া ?
ঐ যায় বুঝি শোনা—
খস্ খস্ ঠক্ চলেছে চলেছে তাঁতীদের তাঁত বোনা ।
এ হাত ও হাত ফিরিতেছে মাকু—ধৈর্য্যের নাহি চ্যুতি,
কার সূতা খুলে' দিয়ে বুক থেকে কার তরে বুনে ধুতি !
কোন মাকুটার দশ টাকা জোড়া কোনটার দশ সিকা—
লোহার মাকু সে লোহাই রয়েছে জন্মায় অহমিকা ।
দেখিনু তন্দ্রাভরে—
তাঁতীর টাকার বড় দরকার, মাকু ছুটাছুটি করে !

চতুর্থ ঝোঁক

হায় রে ভ্রান্ত কবি !
নয়নের আলো ম্লান হয়ে এল আঁকিতে মিছার ছবি !
সারা জীবন এ কোন্ অলক্ষ্য লক্ষ্মীর আরাধনা :
জগৎ ভরিয়া দিয়ে যাও হৃদি-রক্তের আলিপনা ?
দহিলে আপন রূপ
কোন অজানার পূজা উপচারে অমল গন্ধধূপ
এই অফুরাণ স্নেহ,
পঞ্চপ্রদীপ ভরিয়া জ্বালায়ে ধরিলে আপন দেহ ।
পেয়েছ কি সেই লক্ষ্মীর দেখা হয়েছে কি বর চাওয়া,
কত দক্ষিণা মিলিল গো বিনা ফাঁকা দক্ষিণা হাওয়া ?
ছেঁদো কথা কয়ে গেল দিন বয়ে আপন ছন্দে বন্দী,
পেয়েছ তৃপ্তি ! প্রবলের সাথে একতরফা সে সন্ধি ।
অজানাটা অজানাই,—
কেন ছোটাছুটি শোন মোটামুটি কোনখানে সে যে নাই ।

সে কেবল মরীচিকা !
বাহিরে শ্রান্তি ভিতরে ভ্রান্তি, না থাকাই তার থাকা ।
প্রভাত হইতে যে কথা কহিতে সাধিতেছি নিজ গলা,
সন্ধ্যাবেলাও ভগ্নকণ্ঠে সে কথা হবে না বলা ।
কেন এ প্রয়াস ভাই,
যে কথা তোমার হ'ল নাক বলা, নেই সেই কথাটাই !
অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে' ;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে' !
দুঃখেরে তুমি দেবে না আমল, ভাবি' দেবতার দান :
জীবনের এই কোলাহলে তুমি শুনিবে গভীর গান !
—এ সবই রঙিন কথার বিম্ব, মিথ্যা আশার ফাঁপা,
গভীর নিঠুর সত্যের পুরে দিনে দিনে পড়ে চাপা !

কে গাবে নূতন গীতা—
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস--গেরুয়ার বিলাসিতা ?
কোথা সে অগ্নিবাণী—
জ্বালিয়া সত্য, দেখাবে দুখের নগ্ন মূর্ত্তিখানি !
কালোকে দেখাবে কালো করে' আর বুড়োকে দেখাবে বুড়ো ;
পুড়ে' উড়ে' যাবে বাজারের যত বর্ণ ফেরানো গুঁড়ো !
খেলোয়ারি প্যাঁচ দূরে গিয়ে কবে তীরের মতন কথা,
বর্ম্ম ভেদিয়া মর্ম্ম ছেদিয়া বুঝাবে মর্ম্ম-ব্যথা ?
একথা বুঝিব কবে—
ধানভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকে না ঢেঁকির রবে !

বন্ধু, কোথায় ছিলে ?
স্বপনের ঝোঁকে এক ঝাঁক পাখী মেরেছি একটি ঢিলে ।
উড়ে' গেল পাশ দিয়ে,—
কিন্তু এবার ত্রাণ পাওয়া ভার—মরিবে বাসায় গিয়ে ।
বন্ধু গো, আর ভাঙায়োনা ঘুম, কত বার বল' বলি ?
মার খেয়ে কবে হাড় গুঁড়ো হবে, যেমন অপথে চলি ।
বন্ধু, বন্ধু গো,—
গর্জ্জিয়া আসে আমার পাশে কি মরণ-সিন্ধু ও ?
নিষেধ কর সে অত করে' যেন সোরগোল নাহি করে ;
ঘুমের অতলে টেনে নিক্ বলে -- যেমন কুমীরে ধরে !

পঞ্চম ঝোঁক

তোমাতে আমাতে বহুদিন হ'তে হয়নিক কোন কথা,
ইদানি, বন্ধু, পাঁজরে একটা ধরেছে নতুন ব্যথা !
ডাকি ডাক্তারে, শুনে ঘাড় নাড়ে, কবিরাজ বলে 'হুঁউ' !
সহিয়াছি সাঁঝে মাখম সেখের মুখামৃতমাখা ফুঁউ !

কিছুতে কমোন ভাই—
এই প্রসঙ্গে তোমার সঙ্গে কথা কব দু'টো তাই।
গোপনে তোমারে কহিব কারণ, ব্যাপার হচ্ছে এই
গত বসন্তে গলা ভিজাইতে একটি চুমুক নেই!
কি কব তাহার জোর—
বছর কাটিল, কাটিল না তবু বিষম নেশার ঘোর।

সহসা সেদিন—বেজায় কুদিন, সন্ধ্যা অন্ধকারে,
ঘাড় মোড় ভেঙে ড্রেনের ভিতর পড়িলাম একেবারে!
কাদা মেখে উঠি' নেশা গেল ছুটি', পাঁজরে বিষম ব্যথা;
গুনে' দেখি ভাই, একখানা হাড় খসিয়া পড়েছে কোথা!
কথা নহে বলিবার:
আপনিই তাই গোপনে সেখানে জুড়িনু ভেড়ার হাড়!
উপরে মিলেছে বেমালুম হয়ে সিঙান' চামড়া-পটি;
ভিতরে কিন্তু নর-ভেড়া-হাড়ে দিনরাত খটখটি!
হ'ল হাড় জ্বালাতন:
তোমার আমার প্রাণের কথায় হবে তাই প্রলাপন।

প্রাণের কথা যে কয়ে যাই নিজে—বাজে কি তোমার প্রাণে?
প্রাণের কথার অর্থ খুঁজিলে মিলে তব অভিধানে?
জানি জানি সব ফাঁকি!
তবুও খোঁচাই: তোমা ছেড়ে মোর থাকে না কিছুই বাকী।
আমার প্রাণটা যতদূর যায়, যতদূর যেতে পারে,
তুমি ছাড়া আর সাধ্য কাহার সেথা সাথে যাইবারে?
জীবনের মূল খুঁড়িতে খুঁড়িতে যত তলাইয়া যাই,
জীবনের ফুল খুঁজিতে যখনি আকাশটা হাতড়াই,
সকল সময় রহস্যময়! তুমি রহ পাছে পাছে,
হে চিরপ্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।

বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

গুপ্ত ব্যথায় সুপ্তি না হয়, সন্ধ্যা তন্দ্রাভারে,
হেরিলাম কাল—নির্জীব আমি পড়ে' আছি এক ধারে;
চারি পাশে ঘেরা অসীমের বেড়া নীলের প্রাচীর খাড়া,
আলো-আঁধারের গরাদে বসান' অপার বিশ্ব-কারা!
এরি মাঝে ঘুরে তারকা তপন বহিয়া কাহার বোঝা
এরি মাঝে উড়ে কোকিল, পাপিয়া, হাঁড়িচাঁচা, কাদাখোঁচা!
পথ নাই পালাবার;
উঠে পড়ে ছুটে, খুরে' ঘুরে' লুটে, কেবল শ্রান্তি সার।
যুগযুগান্ত ভ্রমণক্লান্ত নিশ্চল কত গতি,
ফাঁক খুঁজে' কত মহা তপনের নিবিল আঁখির জ্যোতি!
তবু নাই কারো ছুটি,
অভ্যাস ঘোরে হাতাড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি'।
অসীমের কারাগার,—
যত যেতে চাও তত যাও, শুধু বেড়ার মেলে না পার।

মশার কামড়ে শুই পাশ ফিরে', নিশ্বাস লই টানি'
দেখিনু সকলে সে অকুল 'জেল'-এ টানিছে বিপুল ঘানি।
কট্ কট্ কট্ চোখ বাঁধা গরু দূরে দূরে ঘুরে' মরে,
খুঁটির চরণে বিশ্রামহীন বিশ্বের তেল ঝরে;
খুঁটি সে নির্বিকার!
ভাবটা এমনি, তেলে কিছু যেন প্রয়োজন নাই তাঁর
অনেক দিনের আলাপ আমার, বন্ধু, তোমার সনে,
ঘানির উপরে শুতে দাও মোরে, গাহিব আপন মনে;
গাহিব ঘানির গান,—
পাষাণের ভারে কেমনে যে বাড়ে তৈলের পরিমাণ।
তোমারি সে পরামর্শে,
গত বৎসরে প্রাণের ভিটায় পাইনু যে কটা সর্ষে;

মনে ভাবিতেছি ঢেলে দিব আজ তোমার ঘানির খোলে,
ভীষণ পেষণে টোপাবে তৈল তোমারি পায়ের কোলে।
তন্দ্রার ভারে পাশ ফিরে' চোখে পড়িল পুনর্বার,
আলো-আঁধারের গরাদে বসানো অনন্ত কারাগার।
উঠে চারিদিকে চিরবন্ধনে ক্রন্দন কোলাহল,
চরণে চরণে বাজে ঝন্ ঝন্ সুকঠিন শৃঙ্খল।
বন্ধু কি তব ফন্দি,—
প্রহরে প্রহরে প্রহরায় ফিরে—তারাও কারারই বন্দী।
সবই কারাগার, কোথা যাবে আর, যত পারে দেয় উঁকি;
শ্যাওড়া-তলায় ফুটে' চেয়ে থাকে সখের সূর্যমুখী!
বন্ধু, আমারে খাটো পিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখ,
এত বড় খাঁচা—মুক্তির ধাঁচা—বিদ্রূপ কোরোনাক।
সীমা নাই যার, নাহিক দুয়ার, না বন্ধ নহে খোলা,
গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?
কয়েদে যখন--ব্যবস্থা কর—কয়েদীরই মত রহি।

নচেৎ মুক্তি দাও—
চারিদিকে এই অসীমের সীমা একেবারে খুলে' নাও।
জীবনে মরণে কর্মে ও জ্ঞানে থাকিব না পরাধীন,
আমার আদেশ না পাইয়া যেন কাটে না আমার দিন;
নাহি যবে প্রয়োজন,
আমার মাথায় আকাশের মেঘ করিবেনা গরজন।
বুঝি প্রয়োজন বহিবে পবন, প্রয়োজনে ঝরে বৃষ্টি,
আপনারে ঘিরে, প্রতি মুহূর্তে গড়িব আপন সৃষ্টি।
যবে পুনঃ হবে সাধ,
প্রাণভরে' কেঁদে ধুয়ে মুছে' দেব নিজে-গড়া অপরাধ।

যদি ভাল লাগে, ভালবেসে তোমা ডাকিব বন্ধু বলে,'
সমানে সমানে ছলনা-বিহীন দিন যাবে কুতূহলে।

চাহিতে মুক্তি হাসি আসে, হায়! পাকাইতে কাঁচা হাত
কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ ?
কেমনে আমারে বুঝাবে বন্ধু, কেমনে বুঝি এ কথা,
কোমল গড়ানো যে বুক, সেখানে কেন সুকঠিন ব্যথা
মোর চেয়ে কেবা জানে ?
হাতুড়ি পেটার পূর্বে লোহারে আগুনে দেওয়াব মানে
কিন্তু আমি যে মেপেছি বন্ধু, লোহার প্রাণের তাপ,
চৌদিকে তার দেখেছি ছড়ান ফুল্কির অভিশাপ !
যে রয়েছে জেগে তার কাছে, ভাই, যুক্তিটা নহে খাঁটি,
ঝাঁঝরা গড়ান,' পুড়িয়ে পিটিয়ে আস্ত লোহার পাটি।
বন্ধু, করুণা কর' ,
তন্দ্রার জাল ছিঁড়িয়া ডুবাও ঘুমেতে গভীরতর।

ষষ্ঠ ঝোঁক

ক'বছর ধ'রে, বন্ধুর দোরে পড়ে আছি দিয়ে ধন্না,
বন্ধু বোধ হয় নারেন চিনিতে, ফিরে'ও ত কথা কন্ না!
রাজা রাজড়ার কাণ্ড সকলি---স্তুতি প্রণতি ও ভক্তি,
জয় জয় জয় সবাই চেঁচায় কণ্ঠে যতটা শক্তি।
দেখাশোনা নেই তবু সকলেই ভক্তি ও প্রেমে হারা,
যেখানে যা পায়, খুঁটে' খুঁটে' খায়, চোখে বহে জলধারা।
না হয় আজিকে কাঙাল হয়েছি, ক্যাঙালী ত আমি নই,
সকলের সাথে পাতাপাতি করে' প্রসাদ বাঁটিয়া লই।
হেথা হ'তে মোর পলা'তে হইল, আগাগোড়া সব মিছে,
অশ্রু জমায়ে গড়ায় যে আঁখি, কেন ঘোরা তারি পিছে!

ঘুমের শরণ নিয়েছিনু আগে, সেটাও দেখি যে ফাঁকি,
ঘুম আসা আর না আসা—সেখানে আমারি বা হাতটা কি ?

উড়ে' যায় আয়ু কালের আকাশে—ডানার শব্দ নাই,
খসে' পড়ে বুঝি দেহের পালক, সে ভয় সর্বদাই ।
ওগো কল্পনা, সাথে সাথে চল'—হালকা তোমার পাখা,
কানে কানে তারে বলে' দাও, ওরে ! সামনে সকলি ফাঁকা !
ধীরে গো বন্ধু, ধীরে !
দেহটা পিছায়ে পড়ে' গেল কিনা—দেখো চাল ফিরে' ফিরে' ।
অকূলের মাঝে বারেক হারালে, আর বৃথা তারে খোঁজা ।
দাব যৌবনে ফাগুন কাটালে সেটা কি এমনি বোঝা ?
কল্পনা তুমি শ্রান্ত হয়েছ, ঘন বহে দেখি শ্বাস,
বারমাস খেটে' লক্ষ কবির একঘেয়ে ফরমাস ।
সেই উপবন, মলয় পবন, সেই ফুলে ফুলে অলি,
প্রণয়ের বাঁশী, বিরহের ফাঁসি, হাসা কাঁদা গলাগলি ।
নব ফরমাস, দিই তোমা, সাজ' কলঙ্কের পর কলঙ্কে,
বুকের রক্ত ছলকে উঠুক হাড়গুলো যাক্ পলকে ।
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, ওই ছুটে যায়—লক্ষ মরণ ঘোড়া,
প্রেমের বল্‌গা বৃথাই কসিছে সোয়ার সে জোড়া জোড়া ।
ঢেলে সাজ, সেজে ঢালো,
সকল দুঃখ সুক্ষ্ম হউক, যত সাদা সব কালো ।

সপ্তম ঝোঁক

তন্দ্রা টুটিয়া সহসা আজি যে সন্দেহ মনে জাগে,
হয়ত তোমায় বৃথা অনুযোগ করিয়াছি আগে আগে ।
যাহা আছে যার, তাহা ছাড়া আর কি পারে সে পরে দিতে ?
অপার দুঃখ তোমা হ'তে তাই ঝরে' পড়ে চারি ভিতে !

হে বিরাট ! আজ হেরি যেন তব দুঃখের নাহি ওর :
চির বর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরান আঁখিলোর !
ওগো অক্ষয় বট !
যত বেড়ে যাও আপনি ছড়াও শত দুঃখের জট ।
তাই কাঁদাকাটি মাথা কোটা-কুটি সকল জগৎময়,
দুঃখ হইতে জনম এদের, দুঃখেই পরিচয় !
সকল দুখের খনি !
শিহরিয়া উঠে পরান, তোমার ব্যথার অঙ্ক গণি ।
সারা বিশ্বের বেদনা বহিয়া কেমনে জীবন চলে !
বুঝেছি প্রাণটা ঠাণ্ডা রেখেছ 'ঘুমিওপ্যাথি'র বলে ।

আনন্দ নহ নহ :
দিচ্ছ দুঃখ নিচ্ছ দুঃখ— দুঃখেরি ফেরি বহ !
যা প্রত্যক্ষ নিঠুর দুঃখ, তারে মায়া ভ্রম বলি,
টেনে' বুনে' তারে আনন্দ বলে আপনারে কেন ছলি
চোখ বুঁজে যারে আনন্দ ব'লে, আনন্দ কর দাদা,
চোখ চেয়ে যদি দুঃখই বলি, কি তাহে এমন বাধা ?
বেদ বেদান্ত প্রাণ প্রাণান্ত আফিং গাঁজার চাষ,—
খুব সম্ভব তাঁর আশে পাশে হয়নাক' বারমাস ।
কিছু আনন্দ কিছু সুখ আর বাকি আঁখিভরা জল,
তোমার আমার যেমন কাটিছে তাঁরো তাই অবিকল !
অশ্রু পরশি' অগত্যা আজ করিলাম আধাসন্ধি
হে চিরদুঃখী ; ব্যথার বাঁধনে ব্যথিতে করিলে বন্দী
প্রণাম প্রণাম—ভাই !
শত ঝঞ্ঝাটে তোমা হেন যেন অঘোরে ঘুমোতে পাই ।

হাট

দূরে দূরে গ্রাম দশবারোখানি,
মাঝে একখানি হাট.
সন্ধ্যায় সেথা জ্বলেনা প্রদীপ
প্রভাতে পড়েনা ঝাঁট।

বেচা-কেনা সেরে বিকাল বেলায়
যে যাহার সবে ঘরে ফিরে' যায় .
বকের পাখায় আলোক লুকায়
ছাড়িয়া পূবের মাঠ ,

দূরে দূরে গ্রামে জ্বলে' ওঠে দীপ—
আঁধারেতে থাকে হাট।

নিশা নামে দূরে শ্রেণীহারা একা
ক্লান্ত কাকের পাখে .
নদীর বাতাস ছাড়ে প্রশ্বাস
পার্শ্বে পাকুড় শাখে !

হাটের দোচালা মুদিল নয়ান.
কারো তরে তার নাই আহবান ,
বাজে বায়ু আসি' বিদ্রূপ বাঁশী
জীর্ণ বাঁশের ফাঁকে :
নির্জন হাটে রাত্রে নামিল
একক কাকের ডাকে।

দিবসেতে সেথা কত কোলাহল
চেনা-অচেনার ভিড়ে :
কত না ছিন্ন চরণচিহ্ন,
ছড়ান সে ঠাঁই ঘিরে'।

মাল চেনাচিনি, দর জানাজানি,
কানাকড়ি নিয়ে কত টানাটানি ;
হানাহানি করে' কেউ নিল ভরে',
কেউ গেল খালি ফিরে' ।
দিবসে থাকে না কথার অন্ত
চেনা-অচেনার ভিড়ে !

কত কে আসিল, কত বা আসিছে,
কত না আসিবে হেথা,
ওপারের লোক নামালে পসরা
ছুটে এপারের ক্রেতা ।
শিশির-বিমল প্রভাতের ফল,
শত হাতে সহি' পরখের ছল—
বিকাল বেলায় বিকায় হেলায়
সহিয়া নীরব ব্যথা ।
হিসাব নাহি রে—এল আর গেল
কত ক্রেতা বিক্রেতা !

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা
পুরানো হাটের মেলা ।
দিবস রাত্রি নূতন যাত্রী,
নিত্য নাটের খেলা !
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নাই ওগো—যে যায় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে
ঘরে ফিরিবার বেলা ।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে
চিরকাল একই খেলা !

নব নিদাঘ

অঙ্গে আমার লেগেছে রে আজ
নব নিদাঘের ঘোর ;
ওরে মন, আয় সাঙ্গ করিয়া
সকল কর্ম তোর !
বিছায়ে নে মোর শিথিল শরীর
শ্লথ আঁচলের প্রায় ;
চেয়ে থাক্ দূরে, অর্ধ শয়নে
আধখোলা জানালায় !

দুপুর বেলার রূপালি রৌদ্রে
ফুলদল পড়ে নুয়ে,
মৌমাছিগুলি গুঞ্জন তুলি
উড়ে যায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে
ফুলের গন্ধ ফুলেরে ঘেরিয়া
গুমট করিয়া আছে,
অমনি গান কি গন্ধের মত
ঘুরে বেড়া মোর কাছে

দূরে বালুচরে কাঁপিছে রৌদ্র
ঝিঁঝির পাখার মত
অগ্নিকুন্ড জ্বালি কে হাপরে
ফুঁ দিতেছে অবিরত !
দিকে দিকে দিকে, জানিনা কি পাখী
হাতুড়ি ঠুকিছে তালে,
কোন্ রূপসীর স্বপ্ন-মেখলা
গড়িছে বিশ্বশালে !

কালো দীঘিজলে গাহন করিতে
নেমেছে গাছের ছায়া.
নিদ্রিত মাঠে নির্জন ঘাটে
জাগিছে এ কার মায়া ?
মরীচিকা চাহি' শ্রান্ত পথিক
ফুৎকারে ফটিক জল.
অঙ্গে আলস আসে জড়াইয়ে
ছাড়ে না অশথতল ।

আজিরে বিশ্ব কি মধু মধুর
মদির নেশায় ভোর ।
মাথায় তাহার ঘুরিছে হাজার
ঘূর্ণি'হাওয়ার ঘোর ।
বাসনা তাহার মরীচিকা হয়ে
আঁকা পড়ে দূর পটে .
কল্পনা তার—গুন্ গুন্ করে
অলিগুঞ্জনে রটে ।

শীতল শিলায় শ্রান্তি বিছায়ে
শিথিল অঙ্গ রেখে.
নিমীল নয়নে মলিন বিরহ
মিলন স্বপন দেখে !
সুদূরে অতীত কাছে আসে আজ
কি গোপন সেতু বাহি' :
অদেখা অগম দাঁড়ায়েছে যেন
মোর মুখপানে চাহি' ।

এসেছে তাহারা দিগন্ত-হারা
সাহারা প্রান্ত হ'তে.

এসেছে রে তারা কোন্ বসোরার
খর্জুরবীথি পথে .
কত বেদুয়ীন্ পার করে' মরু
দীপ্ত অগ্নি ঢালা,
নামায় আমার হৃদয়ের হাটে
তরুণী ইরানী বালা !

মর্মরে গাথা মর্মবেদীতে,
কে পাতি' পদ্মপাতা.
পত্রলেখায় লিখিতে অঙ্ক
ঘুমে ঢুলে' পড়ে মাথা
আঁখি মুদে' একা পড়ে' আছি এই
সুখস্মৃতি ঘেরা নীড়ে.
প্রাণ ভরে' যায় চেনা অচেনার
মিলনমধুর ভিড়ে !

বেলা পড়ে' আসে, বধূ চলে ঘাটে
ভরিতে সাঁঝের জল,
পথপাশে তরু গায়ে তুলে' নিল
চ্যুত ছায়া অঞ্চল !
স্বপ্নান্তরে নিয়ে চলে মোরে
নিদাঘ নিশীথ ঘোর,
ওরে মন আয়, ছিঁড়ে' ফেলে' আয়
সকল কর্ম-ডোর ।

মন-কবি

কাব্যবিহীন মন-কবিরে !

ডুবে' থাক এই ডোবা গভীরে।

নূতন সত্য আর

নাই তোর শোনাবার——

সে কথা চেঁচিয়ে বলে' অপমান হবি রে !

লেখা তোর ছাই——সে তো

জানে, তবু চাইছে তো,

এঁকে যাও বেপরোয়া হিজিবিজি ছবি রে।

'বাকা' উলটি' নিলে

'কাবা' আপনি মিলে

এ কাজও না পার যদি, মর গে আফিং গিলে।

বঙ্গবাণীর সাথ

যে দিন অকস্মাৎ

কমল-দ্বীপান্তরে হয়ে গেল সাক্ষাৎ,

যেমন ছুঁয়েছি পা,

চমকি উঠিল মা ;

কঠিন পরশে মার চরণে লাগিল ঘা।

কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি——

তারাই পূজেছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।

তা বলে' কি কবি——

ওরে হত গর্বী ?

কিছুদিন ধরে' হাতে লাগা তেল চর্বি !

পেতে নে রে শয্যা,

দেখে' শেখ' চারিদিকে ঘটতেছে রোজ যা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে'
মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি---
অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে,
তুইও তাই বল্‌বি ;
বাঁধা পথে চল্‌বি--
আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে ছল্‌বি।
এই কথা লিখে' যায় মহাজন জনা,
তুই না ঢুঁকিবি যদি, সে কথা কি জনা ?
এ কথাটা বোঝনি-
যাই কর---কেটে যাবে জীবনের রজনী !
মাঝে মাঝে সাঁঝ বেলা
ভিতরে কি দেয় ঠেলা---
হ'লেও তা হ'তে পারে মহাকাব্যের ডেলা।
প্রথমেতে না পোষায়, না পোষাক খরচা
ছেড়োনাক ছেড়োনাক ছেড়োনাক চর্চা।
হাতে থাকে সঙ্গীত, কানে যদি ছন্দ---
না হয় হইলে কবি, কথাটা কি মন্দ !
ভয় কি, না ভুলে যদি ভবিষ্য-ভবীরে,
তুই তো তখন নাহি রবি রে---
কাব্যবিহীন মন-কবি

অন্ধকার

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
আজি ভাদ্র অমানিশাযোগে
ক্ষুদ্র ঘরে বন্ধ করি দ্বার,
তোমারে করিব আবাহন,
তোমারে করিব নমস্কার ।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !
জ্যোতিঃরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ ;
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়ে সপ্তরশ্মি-রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ ।
বিচিত্র আলোকচিত্র করি একাকার
দিকে দিকে ব্যাপিবে তোমার
সর্বগ্রাসী স্থির কৃষ্ণহাসি ,
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !

তোমার নিঃশব্দ গর্ভ হতে
রক্তালোক-স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম
যে দিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল ক্রন্দন
ওম্ ওম্ ওম্ ;—
তুমি মাতা মূর্চ্ছাগতা কে করে সান্ত্বন ?
অদ্যাবধি তাই,
বিশ্ব হায়
কেঁদে কেঁদে ফিরে নিঃসহায় ;
কেঁদে ফিরি আমরা সবাই ।

সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,

পিছনে ছায়ায়,

অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়

দ্বিগুণ হারাই !

জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন

যুগে যুগে জীবে জীবে হল চিরন্তন।

দিশাহারা বিদেশী সবাই,

কেহ নাই

ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,

যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের

ক্রন্দনের বীজ—ওম ওম ওঁ।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !

আঁখির এ ক্ষুদ্র তরণীতে সে হয়েছে পার

আলো-পারাবার,

শুধু তার কাছে ধরা দেছে তব অপরূপ

আলোরূপ।

সে দেখেছে—

আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া

কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।

আঁখি মুদে'

সে ব'লেছে কেঁদে,—

'তিমিরে তিমিরহরা সর্বনাশী তুমি মা আমার' :

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !

তাহার শ্রবণে

জীবনের বাদল পবনে

কেবলই পশিছে আসি'

তমঃপুঞ্জ তমালের কুঞ্জ হ'তে

তোমারই সুদূর সেই আহ্বানের বাঁশী।

ঘনঘোর ভাদরের রাতে

সুরের পশ্চাতে

তোমারই গহনে এসে

পেয়েছে সে

নবঘন-শ্যাম শ্যামে তার।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার !

বন্ধ ঘরে মুক্ত করি' দ্বার,

আজি এ অনিদ্র আঁখি-তার।

হেরেছে অগণ্য তারা তোমার মাঝার !

ওরা নাকি নহে ক্ষুদ্র, সব সুবৃহৎ

তেজে ও বিদ্যুতে ভরা জনে জনে বিশাল জগৎ

এত শক্তি, এত তেজ আলো,

না জানি তাহারা

তোমার সাহারা-গায় বিন্দু বিন্দু বারি-প্রায়

কোথায় মিলালো ?

শত সূর্য নাকি

তব মহার্ণবপারে

দূরে দূরে হয়েছে জোনাকি ?

তাই ভাবি আমি, —

আলোরে ক'রেছে ক্ষুদ্র আলোকের স্বামী ;

তোমা-'পরে তাঁর

নাই—কোন অধিকার !

আঁখি-তারা হ'তে

গগন তারার পথে পথে

নিত্য-অনুভূত তব প্রসারিত বিরাট বিস্তার !
নিদ্রিতা-জননী-বক্ষে সুপ্তোত্থিত শিশু
খেলা করে ল'য়ে কণ্ঠহার :—
কোন্ মহাশিশু ক্রীড়াসুখে,
তব বুকে
ঘুরাইছে জ্যোতির্মালা বিশ্বশৃঙ্খলার !
অন্ধকার, মহা অন্ধকার !

অন্ধকার, মোর অন্ধকার !
অসীম মানসাকাশে মম
জনম জনম
কোটী কোটী বৃহৎ জ্বালার
জ্বলে যে নক্ষত্ররাজি, ক্ষুদ্র হ'য়ে বিস্মৃতির পার,
তা'রি 'পরে তব
দাও টানি কৃষ্ণ যবনিকা !
নিভুক নির্বাণ শেষ রশ্মি-শিখা।
দাও সমাপন-শান্তি, দাও সুপ্তি মহাসান্ত্বনার।
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-গন্ধহীন
রসে ভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার।
অন্ধকার, চির-অন্ধকার !

লোহার ব্যথা

ও ভাই কর্মকার,

আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি নাহিক কর্ম আর?
কোন্ ভোরে সেই ধোরেছ হাতুড়ি, রাত্রি গভীর হ'ল,
ঝিল্লীমুখর স্তব্ধ পল্লী, তোল' গো যন্ত্র তোল'।
ঠকা ঠাই ঠাই কাঁপিছে নেহাই, আগুন ঢুলিছে ঘুমে,
শ্রান্ত শাঁড়াসি ক্লান্ত ওষ্ঠে আলগোছে ছেনি চুমে।
দেখগো হোথায় হাপর হাঁপায়, হাতুড়ি মাগিছে ছুটি;
ক্লান্ত নিখিল, করগো শিথিল তোমার বজ্রমুঠি।

রাত্রি দুপুরে মনে নাহি পড়ে কি ছিলাম আমি ভোরে,
ভাঙিলে গড়িলে সিধা বাঁকা গোল লম্বা চৌকা ক'রে,
কভু আতপ্ত, কভু লাল, কভু উজ্জ্বল রবিসম,
কভু বা সলিলে করিলে শীতল অসহ্য দাহ মম।
অজানা দুজনে গলায়ে আগুনে জুড়িয়া মিটালে সাধ,
বড় হ'তে কভু বাহুল্যবোধে মাথা কেটে দিলে বাদ।
ঘন ঘন ঘন পরিবর্তনে আপনা চিনিতে নারি
স্থির হ'য়ে যাই ভাবিবারে চাই, পড়ে হাতুড়ির বাড়ি।

আগুনের তাপে শাঁড়াশির চাপে আমি চির নিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক না প্রবল, করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ, কে বলিল তারে খাদ?
তোমার হস্তে ইস্পাত হ'য়ে সহি' শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটি যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিন রাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি ভাই হ'য়ে ভাইএ পেটে।

ও ভাই কর্মকার !

রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম ধর্মভার.

কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে, আপনার প্রাণে বুঝি.
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা তোমার দিনের রুজি ?
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি ?
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই হাতুড়ির মারফতি !
কি কহিছ ভাই, আমি হব তুমি এই প্রেম সহি যদি ?
পিটনের গুণে লোহা কবে হায় পায় কামারের গদি !

ভক্তির ভারে

বন্ধু,

বহুকাল পরে এসেছি দুয়ারে পরমভক্তবৎ,
ত্রিসন্ধ্যা জপি গায়ত্রী আর নাকে কানে দিই খৎ।
ফোঁটা মালা শিখা ত্রিপুণ্ড্র রেখা মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ,
তুলসীর ফুল, কুশ-কাশমূল, এরা দিবে তার সাক্ষ্য।
তোমার নিন্দা করিয়া যেদিন মুখে উঠে তাজা রক্ত,—
শপথ করিয়া সেদিন বন্ধু হ'য়েছি তোমার ভক্ত।
সিঁদুরমাখানো পাথর দেখিলে তখনই নোয়াই ঘাড়,
পায়ে ধরে' সাধি শীতলার গাধা বিরূপাক্ষের ষাঁড়।
প্রাণপণে অবিরাম
জপি, হনুমান, মুস্কিলআসান, শিব শনি কালী বাম।

মিটায়েছ তার সাধ—
জলে বাস করে' যে মূঢ় করিল কুমীরের সাথে বাদ ;
তোমার উপরে সিধে সত্যেরে গর্বে যে দিল ঠাঁই,
ভিতরের যত চাপা পচা ক্ষত বাহিরে দেখাল তাই।
সৃষ্টির পচা ঝুনা নারিকেল যে-জনা দেখিল নাড়ি',
হাটের মাঝারে স্পর্ধা করিয়া যে-জন ভাঙ্গিল হাঁড়ি ;
তোমার বিধান,—অঙ্কুশ 'পরে হানি ঘন অঙ্কুশ
মত্তহস্তীসম সে চিত্তে করিয়াছে কাপুরুষ।
আজি দুর্বল অক্ষম আমি ভয়-সংশয়-মুক্ত,
প্রেমের পন্থা এই কি বন্ধু ? হ'ল কি মনঃপূত ?
কণ্ঠ চাপিয়া ক্ষুদ্রের' পরে হানিছ রুদ্র রোষ,
ঘাড়ে ধোরে মোরে প্রেমিক করিছ, এত বড় আক্রোশ !

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর

নব নব তব অত্যাচারের মানিনিক বে-আইন,
বাহির হইতে অন্তরে তাই করেছ অন্তরীণ্ ।
বাহিরের হাসি বাহিরের আলো চলে বিপরীত মুখে,
ভুলেও দ্যায় না সান্ত্বনাকণা থ্যাঁৎলানো এই বুকে ।
নিবাইলে সব আলো,
নির্জন পুরী অন্তর ভরি কল্লোলি' আসে কালো ।
শ্মশানের খাটে বাঁধা কাটে চির-অনিদ্র আঁধারাত,
আচমকা পিঠে শুড়্শুড়ি দ্যায় মৃত্যুর হিম হাত ।
মনে মনে যদি দৃঢ় করে' বাঁধি মনটারে যথাসাধ্য,
বেজে উঠে ঘন ভরিয়া শ্রবণ বক্ষে বলির বাদ্য ।
আঁধারের স্রোতে ফেনার মতন থেকে থেকে আসে ভাসি
বিদ্রূপভরা সুহৃদ-কণ্ঠে ওপারের কালো হাসি ।
তবু মাঝে মাঝে হাসি পায় তব হেরিয়া রসজ্ঞান,
'ঘুমিওপ্যাথি'র আবিষ্কর্ত্তা ।----অনিদ্রা-ম্রিয়মাণ !
চার হাত খাড়া মানুষে ভরিয়া সাড়ে তিনহাত ঘরে
কৌতুক দেখ কেমনে নিয়ত মাথা ঠুকে ঠুকে মরে ।
প্রেমমন্দিরে তাহারই বিপদ—যে জন দাঁড়াবে সোজা,
শিরদাঁড়াভাঙা যত কোলকুঁজো ঘাড়-গুঁজোদেরই মজা
নমি জুড়ি' করপুট,---
হে রসিক, তব চরম সৃষ্টি ঘোড়া পিটাইয়া উট !

আমি তাই হ'তে চাই,---
তব নিদারুণ প্রেমিক, বারেক নিষ্কৃতি যদি পাই ।
সাষ্টাঙ্গের প্রণামে প্রণামে হইব অষ্টাবক্র,
বুকের দুগ্ধপিয়াসা মিটাবে তোমার চরণ-তক্র ।
ভক্ত হবার সকল রকম সাধিতেছি কস্রৎ,
দোহাই বন্ধু, আঘাতের ফাঁকে দাও কিছু ফুর্সৎ ।

অসহ্য এই নিজ অন্তরে নিজের নির্বাসন,
ঘুমের আশায় অসীম রাত্রি একাকী এ জাগরণ !
অসহ্য এই বিস্মৃতি-আশে নিয়ত স্মৃতির জ্বালা,-
বুকের উপর হারানো মুখের জপের মুণ্ডমালা ।

কাণ্ডারী

যত শৌখীন জীবন-তরীর তুমি চির কাণ্ডারী ;—

পারিবে বন্ধু চালাতে কি মোর জীবন-গরুর গাড়ী ?
আমার পন্থা নহে মসৃণ, পিচ্ছল জলপথ :
খগার ডাগার ভাঙন ভাঙিয়া চলে এ পুষ্পরথ।
উঠে না এখানে কভু সুবাতাস, কভু বা ঝড়ের দোল,
ফুটে না এখানে কুলু কুলু গীতি, কলকল্লোল রোল।
দাঁড়ের আঘাতে আড়ে তাল রেখে দাঁড়ীরা গাহে না সারি,
ভরা উড়োপালে কষে-ধরা হালে তুফানে জমে না পাড়ি।
খেলে না হেথায় জোয়ার কি ভাঁটা, ঘূর্ণী, বন্যা, ঢেউ,
সাঁঝঘাটে ঘট ভরিবার ছলে দোলায় না এরে কেউ।
তরঙ্গচূড়ে নাচিয়া রঙ্গে যুঝিয়া ঝঞ্চা-সাথে,
লভে না শীতল সুনীল মরণ কালবৈশাখী রাতে।

এ মম গরুর গাড়ী,
এঁটে বাধা টুটা পাঁজরা বন্ধু, ভাড়াটিয়া ভারে ভারী।
আমার মতন কত মহাজন যে পথে হইল গত,
ব্যথাভারে আঁকি' চক্রনেমিতে দীর্ঘ গভীর ক্ষত।
সে অনাদি লিক্ ঠিক রেখে রেখে এ গাড়ী চালাতে হবে,
সহিয়া সঘন ঝাঁকানি, চাকার করুণ আর্তরবে।
হালের ঈষৎ ইঙ্গিত পেলে ফিরে তরণীর মুখ,
সে সব বালাই কিছু ইথে নাই, নাই কোন ভুলচুক্
নাই ঝড় জল বর্ষা বাদল, ধূপ, ছায়া, রাত, দিন ;—
পুরাতন পথে সনাতন যান চলিবে বিরামহীন।
তুমি শুধু ভাই জোয়াল চাপিয়া নিমীলিত আঁখে বসি' ;
ঝিমাতে ঝিমাতে দক্ষিণে বামে পাচন চালাবে কসি।

গরুর গাড়ীর গরু এ বন্ধু, বোঝাই গাড়ীর গরু ;—
এদের চালাতে লাগিবে না ভাই শিঙা বেণু ডম্বরু ।
হাতের গোড়ায় যে কচা মিলিবে পথের পাশের বনে,
তারি ঘায় ঘায় যাবে ঠায় ঠায় পরম তুষ্ট মনে ।
কভু ওলা কভু দাবা হবে গাড়ী কখনো চলিবে বেঁকে,
চিহ্নিত পথে অবিচ্ছিন্ন চলার বেদনা এঁকে ।
নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি,
মাঝে মাঝে নিক্ এমন গভীর বুকে ঠেকে যাবে মাটি ।
তথাপি বন্ধু, হতাশ হ'য়ো না, গরুর গাড়ীর গরু
জাওর কাটিয়া পার হ'তে পারে মরীচিকাহীন মরু ।

কাণ্ডারী, কাণ্ডারী !

নিরুপায়, তাই সঁপি তব হাতে এ মোর গরুর গাড়ী ।
জানা আছে তব কালবোশেখীতে হাল ধোরে ঢেউএ দোলা,
জান কি বন্ধু কাঁধে চাকা মেরে দকে-পড়া গাড়ী তোলা
তরী বাওয়া আর গাড়ী খেদানোয় অনেক তফাৎ ভাই,
এর বাড়া আর গৌরবহারা হীন কাজ কিছু নাই ।
না থাক্ আমার বরাতে বন্ধু
করিব না অপমান,-
চিরদিবসের কাণ্ডারী ধোরে
করে দিয়ে গাড়োয়ান !

জীবন ও মৃত্যু

জীবনতত্ত্ব যত ভাবি মোরা নহে তত বেশী কূট,—
জীবনের মানে,—মরণ-তাড়নে উঠে' পড়ে' শুধু ছুটা।
বেদ-বেদাঙ্গ, দাঙ্গা-ফ্যাসাৎ, দান, ধ্যান, খুন, চুরি,
প্রেম-কাম-ক্ষুধা ঘুম-জাগরণ শোওয়া-বসা হামাগুড়ি,—
ইত্যাদি যত জীবন-ব্যাপার সব মূলে একই ব্যথা,—
মৃত্যুভয়ের কারণসূত্রে জীবনের মালা গাঁথা।
সূত্র যেমনি টুটে ;—
ধূলায় ছড়ানো মালার টুকরো, পাঁচভূতে লয় লুটে'।

আলোকের এই নেপথ্য হ'তে আঁধার মঞ্চে নামি'
সে রাতে সহসা মহা অভিনয়ে পাছে যায় কেহ থামি',
প্রতিরাতে তাই নিদ্রার ছলে ঘর্ ঘর্ সাঁই সাঁই
ভুবন ভরিয়া চলে জীবনের মৃত্যুর আখড়াই।
তবু নাহি টুটে ভয়,----
অজানার সাথে চোখোচোখি হ'লে না জানি কেমনই হয়!

কল্পনাতীত সেই কাল-রূপ, যুগ যুগ মাথা খুঁড়ি,
কবিও পায়নি ভাবে কি ছন্দে মৃত্যুর কোন জুড়ি।
তবু মৃত্যুরে আত্মীয় করে' রচে' যায় তারা গান,---
রাতে ভূতভীত পান্থ যেমন প্রান্তরে ধরে তান।
ধ্যানের জ্ঞানের ওপার হইতে বিফল ফিরিল যারা,
নিয়ত বিকট ওঁ, হ্রীং ফট্ প্রলাপ বকিছে তারা।
মরণাতঙ্ক রোগে,---
কি হবে গুণীর মিছে ঝাড় ফুঁকে কবির মুষ্টিযোগে?

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের হাহাকার কম্পন,
মিলন যেমন বিরহের ভয়ে মুখে মুখ বুকে বুক,
জীবন তেমনি মরণের ভয়ে হৃদয়ের ধুক্ ধুক্।
যত খুলে যাক পাক,
মরণেরই দমে জীবনের ঘড়ি টিক্ টাক্ ঠিক ঠাক্।

আত্মা সহসা আত্মস্বপ্নে কালভয়ে হয় ভীত ;
তখনি লভিয়া উন্দামগতি হয় সে জীবনায়িত।
সে ভয় যেমন ছুটে,
মরণপ্রবাহতাড়িত জীবনবিম্ব অমনি টুটে।
নিজেরে ছলিতে বাহাদুরি নিতে মিথ্যা বোলো না ভাই,
মরণের আগে মরণের ভয় কারো কভু কাটে নাই।

রেলঘুম

ঢং-ঢং-ভোঁ---ভস্

টু-ডাউন্ ছাড়ে, বাস্!

ভস্ ভস্ ঢক্কোর,

চলে খায় টক্কোর।

ঘোস্ ঘোস্ ঘোস্ ঘোস্

গদিটায় দিই ঠেস্।

ঘেস্ ঘেস্ খেটে খেটে,

ঘুমে আসে চোখ এঁটে।

হুস্ হুস্ সাঁই সাঁই,

বায়ুর বিরাম নাই,

উড়ে চলে কোন্ ঠাঁই?

আয়ুর বিরাম নাই,

থামিবে সে কোন ঠাঁই!

(ছোট স্টেশন)

ধকা ধাঁই ধকা ধাঁই,

এখানে থামিতে নাই!

ঝকা ঝকা ঝাঁকি ঝাঁকি,

অমন করুণ আঁখি!

কেমনে সে দিল ফাঁকি?

আর তারে পাব নাকি!

ধক্ ধক্ ধক্কা,

সব ফিরে ফক্কা!

হুটোহুটি ছুটোছুটি
কাশী আর মক্কা ;—
কে জানে কাহার তরে
কোথা জাগে ধাক্কা ?

(পুলের উপর)

ধস্——গড়্ গুড়ুর্ গুম্,
গুড়ুর্ গুড়ুর্ গুড়ুর্ গুম.
বর্ষার মর্সুম্
নদী জলে বড় ধুম্.
গুড়ুর্ গুম্ গুড়ুর্ গুম্.
ঝাঁপ দিয়ে পড়্লুম্
সে অতলে ডুব্লুম .
গুম্ গুম্ ঘুম ঘুম.
নদীতলে নিরঝুম্
নিরঝুম্ চিরঘুম, ---

(পুলপার)

গুড়ুর্ গুম্---ঘচ্চো
ঘচ ঘচ ঘচ্চো
ওখানে কি কোচ্চো
বাধা পথে গচ্ছ !
ঘচাঘচ্ ঘত্তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর .
কি সাত কি সত্তোর,
মাঝে মাঝে দোত্তোর,---
প্রলাপ সে মত্ত'র
উঁচু নীচু গর্ত্ত'র

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

পথ নয় পথ তোর ;—
লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর !

(পয়েন্ট্স্ ক্র্সিং)

খচাখচ্ ঘটা ঘাই,
সে পথে ত আর নাই ।
পেরেছি গো, পেরেছি গো,
সে পথটা ছেড়েছি গো ।
ঘ্যাস ঘ্যাস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাস্,
কি আরাম ব্যাস্ ব্যাস্ !
পায়ে মোর পথ বশ,
হাতে বাধা হাত-যশ ,
ঘ্যাস্ ঘ্যাস্,—খটকা,
ফের লাগে খট্‌কা !
কি বল্‌ছে ? দোস্তোর---
লোহা-বাধা পথ তোর,
লোহা-বাধা পথ তোর !

ঘটাঘর্ ঘেস ঘাস্
দিতে পার ঘুঁষ-ঘাষ ?
মাপ হ'তে পারে ফাঁস !
ঘস্ ঘস্ ধক্কো,
কিসের কি দুঃখ ?
বিচার ত সূক্ষ্ম ;
পেতে পার মোক্ষও !
ঘসে' ঘসে' মোক্ষ !
ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘস্
কি আরাম ব্যাস্ ব্যাস্ !

(দূরে সিগ্‌ন্যাল ডাউন্)

ঘস্ ঘস্ ঘচ্চান্,
দূরে দ্যায় হাতছান্ !
কেমনে দিগন্তে
কে পেরেছে জান্‌তে ?
আগ্‌বারি আন্‌তে
এই পথ-প্রান্তে
লাগে হাতছানতে !
ঘস্ ঘস্ ঘশ্রাম্,
হোথা চির বিশ্রাম ?

(ছোট ষ্টেশন)

ঘেটা ঘ্যাঁয়্ ঘেটা ঘ্যাঁয়্,
হেথা নয় হেথা নয় ।
ঘায় ঘায় গোটা গোটা,
হায় হায় কোথা কোথা !
ঘরসাঁ ঘেঁই তো—
আমার সে এইত !
ঘেটা ঘ্যাঁয়্ ঘেটা ঘ্যাঁয় ।
হেথা নয় হেথা নয় ।
ঝকা ঝকা ঝন্ ঝন্
ওগো একি বন্ধন !
পথের কি বন্ধন ?
চিরসাথী ক্রন্দন !
ঝকা ঝকা ঝাঁক্কি,
আগাগোড়া ফাঁক্কি,
ঝাঁক্ কই ঝাঁক্ কই,
এ পথের ফাঁক কই ?
হা হা হা হা—ঘস্তোর—

লোহা-বাঁধা পথ তোর,
লোহা-বাঁধা পথ তোর।
ধা তিন্ তা তিন্ তা,
কিসের বা চিন্তা?
ঝকাঝকি বকাবকি
কেটে যাবে দিনটা।
ধকা ধাই ধাত্রি--
ছেয়ে আসি রাত্রি।

(আপ ট্রেন পাস্ করে)

ওকি ওই সম্মুখে
ধেয়ে আসে মোর বুকে
খুন মাখি লাল-আঁখি
আন্ পথ-যাত্রী।
ঘচা ঘচ্ ঘ্যাচ্চ
হাঁচি পড়ে হ্যাচ্চ----
ঘরদ্বার চারধার
ভেঙ্গে চুরে দুরদার্--
ধূমকেতু দুর্বার
কোথা ছুটে যাচ্চ?
সুনীল করুণ আঁখি
দেখতে কি পাচ্চ?
এ প্রলয়ে এ আঁধারে
ওগো কোথা যাচ্চ?

(পুলের উপর)

গুড়ুং গম্ গুড়ুং গম্
গুড়ুং গুড়ুং গম্ গম্,
নিশীথিনী চম্ চম্,

উপরে জমাট মেঘ
নীচে নদী দুর্দম্.
গড়ে ভাঙ্গে হর্দম্
তড়িৎ-চাবুকে ছোটে
ঝঞ্ঝা-তুরঙ্গম.
বারি ঝরে ঝম্ ঝম্
পৃথ্বীটা ঘেঁটে গোটা
পায়ে ছেনে কর্দম.
গুড়ুম্ গুম্ গুড়ুম্ গুম্.

(**পুলপার**)

গুড়ুম্ গুম্ — ঘুচ্চুই
কোথা নেই কিচ্ছুই !
গগন ভরিয়া তারা
বাগান ভরিয়া ভুঁই !

(**দূরে লাল সিগ্ন্যাল**)

তবুও দিগন্তে
আমারি কি পন্থে.
কে ওই রাঙায় আঁখি
কটমট দন্তে ?
কস্ কস্ কট্ কট্.
আর যাওয়া দুর্ঘট।
প্রান্তর প্রান্তর.
অন্ধ তেপান্তর !
ঘুৎকার ফুৎকার
মিছামিছি চীৎকার !
ছুটাছুটি নিষ্কাম.
ওরে মূঢ় থাম্ থাম্ ।

পথে খাসা প্রাপ্তি

সহসা সমাপ্তি !

(সিগ্‌ন্যাল ডাউন)

না না না না চল্‌ চল্‌

শুধু ছল শুধু ছল !

ঘাস্‌ ঘাঁই ঘাস ঘাঁই

আর নাই আর নাই

ভয় নাই বাধা নাই,

থির আঁখে ওই ডাকে

সবুজের রোশ্‌নাই,

আর আপ্‌সোস্‌ নাই ।

(থামিবার পূর্বে স্টেশনে প্রবেশ)

টক্কোর টক্কোর

ঘটা ঘটা টক্কোর,

চোখ বুঁজে পথ খুঁজে

কত খাই টক্কোর !

ধিকি ধিক্‌ ধিকি ধিক্‌,

এই পথ ঠিক ঠিক ।

ধুক্‌ ধুক্‌ ধুকু ধুক

কত ভুল কত চুক্‌

ধুকু ধুকু ধুক্‌ বুকু,

পারিনে এ পথ টুকু !

ধুকু ধুকু ধক্কাৎ,

থাম্‌লাম্‌ নির্ঘাৎ,

মৃত্যুর সাক্ষাৎ ।

যমরাজ,—খোল খাতা,—

একি এ যে কোলকাতা !

দুখবাদী

তা'রই পরে তব কোপ গো বন্ধু, তা'রই পরে তব কোপ,
যে জন কিছুতে গিলিতে চায় না এই প্রকৃতির টোপ।
সুনীল আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল,
গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি, সুন্দর ধরাতল!
ছবি ও ছন্দে তোমারি দালালি করিছে স্বভাব কবি,
সমসুন্দর দেখে তারা গিরি সিন্ধু সাহারা গোবি।
তেলে সিন্দূরে এ সৌন্দর্যে 'ভবি' ভুলিবার নয়,
সুখ-দুন্দুভি ছাপায়ে বন্ধু উঠে দুঃখেরি জয়।
অতল দুঃখ সিন্ধু,
হাল্কা সুখের তরঙ্গ তাহে নাচিয়া ভাঙিছে ইন্দু।
তাই দেখে যারা হয় মাতোয়ারা তীরে বসে' গাহে গান,
হায় গো বন্ধু, তোমার সভায় তাহাদেরি বহু মান।
দিগন্তপারে তরঙ্গ আড়ে যারা হাবুডুবু খায়,
তাদেব বেদনা ঢাকে কি বন্ধু, তরঙ্গ সুষমায়?
বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘন শ্যাম শোভার তারিফ্ সে বংশে কেবা করে?
ঝড়ে যার কুঁড়ে উড়ে,
মলয় ভক্ত হয় যদি, বল কি বলিব সেই মূঢ়ে!
ফাল্গুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ-পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভাকবি, আমরা বন্ধু, দুখবাদী বৈরাগী!

এই বিশ্বের ব্যবসার লাভ বন্ধু তুমি ত জান'
একা বসে যবে রাতের খাতায় দুঃখের জের টানো।

জমা খরচের কৈফ্যৎ কেটে বাকী যে ফাজিল কত,
বাহিরে 'বিজ্ঞাপনে' যাই বল, অন্তরে বুঝিছ ত !
বজায় থাকিতে খ্যাতি,
সহসা জ্বালাবে কোন সন্ধ্যায় প্রলয়ের লাল বাতি !
সুখে মোড়া দুখে ভরা কতবড় রচিয়াছ কৌশল,
এ ব্রহ্মান্ড ঝুলে প্রকাণ্ড রঙিন মাকাল ফল ।
সৌন্দর্যের পূজারী হইয়া জীবন কাটায় যারা,
সত্যের শাঁস কালো বোলে খাসা রাঙা খোসা চোষে তারা ।

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা ?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা ।
চটক বা টখা কি জানে প্রেমের ? বকে কি শিখাবে ধর্ম ?
সহজ স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন মর্ম ।
অরণ্যতরু জপিছে অন্ধঠেলাঠেলি অবিরাম,
কুসুম অলির অবাধ প্রণয়, উভয়তঃ কি আরাম !
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আনমনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধোরে রঙিন বারাঙ্গনা !
খাদ্যে খাদকে বাদ্যে বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড়ঋতু ছলে ষড়রিপু খেলে কাম হ'তে মাৎসর্য ।
ছলে বলে কলে দুর্বলে হেথা প্রবল অত্যাচার ;
এ যদি বন্ধু হয় তব ছায়া, কায়া ত চমৎকার !

শুনহ মানুষ ভাই !
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই ।
যদিও তোমারে ঘেরিয়া র'য়েছে মৃত্যুর মহারাত্রি,
সৃষ্টির মাঝে তুমিই সৃষ্টিছাড়া দুখ-পথ-যাত্রী ।
তোমাদেরি মাঝে আসে মাঝে মাঝে রাজার দুলাল ছেলে,
পরের দুঃখে কেঁদে কেঁদে যায় শত সুখ পায়ে ঠেলে ।

কবি-আরাধ্য প্রকৃতির মাঝে কোথা আছে এর জুড়ি ?
অবিচারে মেঘ ঢালে জল, তাও সমুদ্র হ'তে চুরি !
সৃষ্টির সুখে মহাখুসি যারা, তারা নর নহে, জড় ;
যারা চিরদিন কেঁদে কাটাইল তারাই শ্রেষ্ঠতর ।
মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ !
সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে ।

নবান্ন

এসেছ বন্ধু ? তোমার কথাই জাগ্‌ছিল ভাই প্রাণে,
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা অঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ।
লেপিয়া আঙিনা দ্যায় আল্‌পনা ভরা মরাইএর পাশে ;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যজি' এবার নিবসে চাষে।
এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পরে মই !
দাওয়ার খুঁটীতে ঠেস দিয়ে বসো,—সে দুখের কথা কই।

বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,—
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল ক'রে কভু সেচিনু পান্ডু চারা।
কার্ত্তিকে দেখি চারিদিকে,—একি ! এবার ত নহে ফাঁকি !
পাঁচরঙা ধানে ছক্‌কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি।

অঘ্রানে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে।
আমি রোজ ভাবি ফসলটা নাবী, আরও ক'টা দিন যাক্‌,
ভরা অঘ্রানে ঘটেনা তো কোনো দৈব দুর্বিপাক।
মরাই-সারাই শেষ ক'রে, সবে খামারে দিইছি হাত,
কাল্‌কে হঠাৎ,—
বন্ধু, দোহাই তুলো নাকো হাই, হইনু অপ্রগল্‌ভ—
ক্ষমা করো সখা,—বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প।

তার চেয়ে এস প্রভাত আলোকে চেয়ে থাকি দূরে দূরে,—
বাঁকা নদী যেথা চরের কাঁকালে জড়ায় জরির ডুরে।
যেথায় আকাশে ভুলে' নেমে আসে মানস-মরালশ্রেণী,
যেথা দিক্‌বালা শীতের বেলায় এলায় আঁচল্ল বেণী।
উঠো না বন্ধু, অঘ্রান মাস,—তাহে নবান্ন ভাই।
আজিকার দিনে চাষার ঘরে যে কুটুম ফিরাতে নাই।
বারবেলাটুকু কাটুক দেবতা, ঘুরে আসি ক্ষেতখানা,
মইডলা ভুঁই ঘেঁটে খুঁটে' আনি যা' পাই ধানের দানা।
চিরান্নহীন নবান্নদিনে এসেছ আমার ঘরে,
শুভখনে শেষ অন্নপিন্ড অর্পি' পরস্পরে,
চরম প্রণাম করিব যখন, বন্ধু মাথার কিরে—
ফণায়িত করে আশিস ঢালিয়া দংশিও মোর শিরে।

ফেমিন্-রিলিফ্

আয় আয় আয় রে !
বেলা ব'য়ে যায় রে !
দারুণ আকালে হায়, বিধাতার করুণায়—
রিলিফ্ নেমেছে ভাই গ্রামের সীমায় রে !
বেঁধে নে বেঁধে নে শিরে
পাক-দেওয়া ছেঁড়া বিঁড়ে,
কাঁধে তুলে নে রে ভাই কোদাল ও চুব্‌ড়ি ;—
দেখো দেখো মতি মিঞা পোড়ো নাকো থুবড়ি !
ওদিকে হ'তেছে বাঁধা বসোয়ার বোরো-বিল,
এদিকে হ'তেছে খোদা শুক্‌নো সাগর—ঝিল।
তিন আনা চৌকা,—
ভুখা পেটে খেটে খা,
দলে দলে লেগে যা,—
কে বলে কঠিন মাটি ? না পোষায় ভেগে যা !
ঘরে ব'সে মড়কে
চ'লেছিলি নরকে,
না হয় কোদালহাতে মর্‌বি এ সড়কে।
খাট্ তবে খাট্ রে !
ডোঙা পেট কোঙা কোরে গোঙা মাটি কাট্ রে !
যা বলি তা বলি ভাই, মাটিটে কি রুগ্ণ !
মাংসের লেশ নাই, হাড় গোড় শুক্‌নো।
ঝাঁ ঝাঁ করে দিক রে।
রোদে ফাটে টিক্‌রে,
ঠনকি টন্‌কো মাটি কোপ উঠে ঠিকরে।
হাত্তোর ভগবান ?

দিল্লি কি কঠিন প্রাণ,
কাঁকুরে এ কড়া ঢ্যালা তারও চেয়ে কড়া জান !
ঠিক্ রোদে খাটি রে,
কত মাটি কাটি রে,
না জানি সে কত বড় যারে দেবো মাটি রে !
—এঁই—থুড়ি, চোপ্ চোপ্ !
হেঁই মারো মারো কোপ্,
কারো' পরে নেই কোপ্,
শুধু কোদালের কোপ্ !
আয় দাদা আগিয়ে,
ঝুড়ি ধর্ বাগিয়ে,
তাতাপোড়া দেহ-খানা দিস্ নেকো রাগিয়ে ।
জোয়ান রে হেঁইয়া !
ভ্যালা মোর ভেইয়া !
আমি কাটি কপাকপ্,
তুই তোল্ টপাটপ্,
মেলে' দুটো পাঁজরা,
খাঁজকাটা ঝাঁঝরা
মাজাদোলা ছুটপায়ে ফেলে আয় ঝপাঝপ্ ।

পিল্ পিল্ পায় পায়,
পিঁপড়ের সার যায়,—
দীর্ঘ দীঘির গায়,
হায় হায় হায় রে !
মেটে কুলি যায় রে,
পেটের কি দায় রে !
তবু ত পেটের ঋণ
জমে যায় দিন দিন,
বেনুন রেঙুন্-খুদে

সুদ শুধু যাই শুধে'
প্রাণটাকে যত কসি, ধড় করে ঝিন্ ঝিন্ !

ওকি, ওরে মেণ্টা !
গেল বুঝি তেণ্টা ।
তোদের কণ্ট মেটে তারই ত এ চেণ্টা ।
এবারের বৈশাখ
পিপাসাটা চেপে রাখ ,
প্রাণপণ কুদ্‌লে'
এ দীঘিটা খুদ্‌লে'
নাগাৎ শ্রাবণ ভাই,
জলের কি ভাবনাই ?
যত জলকণ্ট
একেবারে নণ্ট ;
তুই যদি না থাকিস তোরই সে অদৃণ্ট !

দফাদার মামা গো !
মাটি না এ ঝামা গো ?
যাই হ'ক রফামত তোর মুখ থামাবো ।
সবই জানো বাপধন ! খেটে' সারা দিনটে,
রোজগার দু'আনার, খেতে পেট তিনটে ।
তারও এক আধ্‌লা !............
দাঁড়িয়ে যে বাদ্‌লা ?
ছেলেটা ? বালাই গেছে, তুই ভাই কোদ্‌লা ।
এই ছোঁড়া সুখলাল !
কোন্ দুখে মুখ লাল ?
মোড়লের পো ব'লে কি কম ক'রে দেবে গাল ?
ওই মোলো ছুঁড়িটা,—
ছুঁড়িটা না বুড়িটা ?

নাহক্ হুঁচুটে' প'ড়ে ভাঙে নয়া ঝুড়িটা।
কি কর রহিম চাচা এই বুড়ো বয়সে !
লুকিয়ে চৌকো চাঁচা ! ধর্মে কি সয় সে ?
আচ্ছা, বলত চাচা, এত যারে ডাক্‌লে—"
সে বিধি মেহেরবান
হিঁদু না মোছলমান ?
পোড়াব না গোর দেবো দেহখানি রাখ্‌লে ?
দূর হোক্ — মাটি কাটো, কেবা জানে কিসে কি,
যতই ঘুলিয়ে দাও, তেলে জলে মিশে কি ?
খেতে পাও নাই পাও শুধু চল কুপিয়ে,
বুড়ি বেটী মাটিটাকে আগাগোড়া চুপিয়ে,
মায়াবিনী শয়তানী চির বহুরূপী এ।
কার ধন দ্যায় হরি কারে চুপি চুপি এ।
মারো এরে কুপিয়ে।
বুকে বুঝি মুখ বেয়ে খুন ঝরে টুপিয়ে।
চল্ চল্ কুপিয়ে !
কেবা শোনে কার কথা ? কাঁদিস্‌নে ফুঁপিয়ে,
কোপের উপর কোপ ফ্যাল ঝুপঝুপিয়ে
কোদালের মুখ হ'তে নে-রে চাপ লুফিয়ে।
চল মাটি কুপিয়ে,
চৌকোর চারকোণ ঠিক মাপ-জুপিয়ে।
খুন ঝরে টুপিয়ে রে, জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
ওই দ্যাখ্ চৌকোর চারদিকে গল্‌দি।
আমার চৌকো মেপে' পাবে কেউ ফাঁক কি ?
বুকে তার সাক্ষাৎ শিবরূপী সাক্ষী।
হেঁই চল্ কুপিয়ে,
শক্ত বেহায়া মাটি রক্তেতে ছুপিয়ে।
খাল ধরে বুকে রে !

খুন ঝরে মুখে রে !
মাটির কঠিন টানে শির পড়ে ঝুঁকে রে !
ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—জোল্‌দি রে জোল্‌দি,
কড়া রোদে খামকা কে গুলে' দিল হল্‌দি ?
ডুব্‌লো কি চাকি ওই ?
পুব কোণে দু' কোদাল এখনো যে বাকী ওই ।
কোদাল কি হাতে নেই ? নেই কুছ্‌পরোয়া,
মাটিটুকু দাঁতে কাটি এ মোদের ঘরোয়া ।
নখে দাঁতে মাটি কাটি, ভ'রে নেই আঁজলো ;
মাটি কাটা প্রাণ আজ মাটি পেয়ে বাঁচ্‌লো !
কাঁদিস্‌নে খোকাধন, ভাবিস্‌নে বৌ গো !
আজ ত কেটেছি মাটি পুরো এক চৌকো ।
বুকে পিঠে মাটি চাপে ! এ মাটি কে মাপে রে !
হক্ মাটি মাপ দিতে প্রাণ কেন কাঁপে রে !
মাপদার ! মাপ দাও ও হাতেরি মাপা ওই
নয়নজলের আমি নিমকহ'রাম নই !

শর-শয্যায় ভীষ্ম

কুরুক্ষেত্রে চিরস্তব্ধ ভীষণ সমর-মন্দ্র .
অন্তিম নতি লহ ভীষ্মের অস্তোন্মুখ চন্দ্র !
বংশের মোর হে আদি-দেবতা ! দাঁড়াও আঁখির আগে,
মরণ-পন্থে সন্তান তব শেষ স্নেহাশিস মাগে ।
তুমি জানো দেব, কোন্ গূঢ় খেদে শরের শয্যা পাতি'
শিশুর মতন কাটায় ভীষ্ম দিবসের পর রাতি ।
কেন একা অনাদৃত
আপনবংশ-বন্ধুংসের মাঝে পড়িয়া জীবন্মৃত !
দেবব্রতের নিজ পৌরুষে অর্জিত অমরতা
হেলায় ফেলিয়া কেন চ'লে যাই,—তুমি জানো সব কথা ।

একে একে যবে সাত ভাই ডোবে জননীর স্নেহ-নীরে,
লীলাকৃতার্থ স্বর্গের মাতা স্বর্গে গেলেন ফিরে !
বিস্মৃতি-তলে মা'র মুখখানি আজও খুঁজি, হায় মোহ !
দেবী হ'য়ে নরে গর্ভে ধরিল,—এই ত অনুগ্রহ ।
সেই জাহ্নবী মিটালেন যাঁর যুব-চিত্তের ক্ষোভ,
পরিণামে হায় জন্মিল তাঁর ধীবর-সুতায় লোভ !
বৃদ্ধ পিতার সে মত্ততার প্রায়শ্চিত্ত-আশে,
নবযৌবনে কামনা-নাগিনী বাঁধিনু সত্য-পাশে ।
রাজ্যের লোভে বংশে যাহাতে না ঘটে ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব,
পণ ক'রেছিনু—তুমিও তাহাতে সাক্ষী ছিলে ত চন্দ্র !
আজি শর-শয্যায়
মূঢ় কিশোরের সে দৃঢ় দুরাশা মনে প'ড়ে হাসি পায় !
কৌরবকুল-গৌরব ভাবি' বিমাতার সুতে পালি',
তুমি জানো দেব, কি অগৌরবে একে একে দিনু ডালি ।

'চন্দ্রবংশ নির্মূল হয়',...বিমাতা সাধিয়া কহে ;—
ইঙ্গিত বুঝি' কহিনু—'জননি, সে ত আমা হ'তে নহে।'
বিস্ময়ে শুনি,—ব্যাসমুনি মোর ঋষিজ কানীন ভাই !
—যত তেজই হায় থাক্ অনলের পোড়াতে পারে না ছাই
খর দিবালোকে মিটে নদী-বুকে মুনির মনের আশ,
ধরণী সে লাজে আজও মাঝে-মাঝে টানে কুজ্ঝটি-বাস !
শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সম্মতি দিনু, সহজ বুদ্ধি ঠেলে,—
আমার বংশে জন্মিল এসে অন্ধ পাণ্ডু ছেলে !
শোন দেব, মোর শরের শয্যা নহে নহে অকারণ,
কুলবধূ নিয়ে সেই কদাচার, আজিও পোড়ায় মন !
ধর্ম হ'তে ! না হয় সেদিনই লোপ হ'ত কুরুকুল ;
সাথে সাথে যত ভারত-ক্ষত্র হ'ত না ত নির্মূল।

জ্যেষ্ঠ রহিল বদ্ধ করিয়া আপন অন্ধ কারা,
যৌবনযোগে পাইল পাণ্ডু পিতৃব্যের ধারা।
হীনবীর্য সে বসিয়া দেখিল বংশের অপমান,—
দেবতা আসিয়া যুবতী জায়ারে করিছে পুত্রদান !
ছিল বটে প্রথা পিতামহদের আনে ত্রিদিবের মেয়ে,
চতুর দেবতা প্রতিশোধ তাই দিল কি সুযোগ পেয়ে ?
দেব-কৃপালোভী তপঃসিদ্ধ মূর্খ মুনির বরে
ধর্ম আসিয়া অধর্ম করে মূঢ় মানবের ঘরে।
ক্ষত্রিয় যুবা মরে ক্লীবহেন বনে রমণীর বুকে !
পঞ্চ পুত্র সাথে ল'য়ে রাণী ফিরে এল অধোমুখে।
পাঁচ জনে কহে পাণ্ডুসুতের পঞ্চ দেবতা পিতা !—
রোমে রোমে মোর শরের বেদন,—আজও তবু ভুলিনি তা' !

দ্বন্দ্ব বাধালো অন্ধের ছেলে দম্ভী দুর্যোধন ;—
মরণ-তোরণে কেমনে কহি তা একান্ত অকারণ ?

দুঃখ মোর এই---ক্ষত্রিয় হ'য়ে আশ্রয় করে ছল ;
মুগ্ধ আমারে ক'রেছিল বটে পাণ্ডব-বাহুবল ।
আজিও ভুলিনি—পাঞ্চাল-ভূমে কৃষ্ণা-স্বয়ম্বরে
একক যুবক অযুত রাজায় বিমুখ করিছে শরে !
সে কি আনন্দ ! —প্রভাতে যখন শুনিনু পার্থ সেই ।
সে যে কি লজ্জা ! দূতমুখে যবে শুনি পরক্ষণেই—
মাতার আদেশ পেয়ে
পাঁচ ভাই ভাগে বিবাহ ক'রেছে স্বয়ম্বরের মেয়ে ।
হে কুলদেবতা ! তোমার অঙ্গে কত কলঙ্ক সহে ?
পশুপতি কি কুলগত হ'ল ? ব্যভিচার কা'রে কহে ?
শুধু বংশের কল্যাণ ভাবি' সে বিষও কণ্ঠে ধরি ;—
শর-শয্যায় সবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি ।
রাজ্য লইয়া কুরু-পাণ্ডবে আবার বিবাদ বাধে ,
দম্ভে ধর্মে পাশাখেলা চলে ! নীরব রহিনু সাধে ?
পাশার বাজীতে রাজ্য হারিয়া রাখিল পত্নী-পণ !
পুত্তলীপ্রায় দেখিনু যা' সব করিল দুর্যোধন ।
নির্বাক হ'য়ে ভাবিতেছিলাম ;—কোন্ লজ্জাটা ভারী ?
---পাশা জিনে রাজা সভার মাঝারে উলঙ্গ করে নারী, —
না,—ব্যসনাসক্ত ধর্ম ওদিকে সত্যের অভিমানে
ক্ষত্র হইয়া দেখে,—পত্নীর কটির বসন টানে ?
ভার্গবজয়ী ভীষ্ম সেদিনও আবার করিল ভুল,—
না করি' অস্ত্রে কুরু-পাণ্ডব একসাথে নির্মূল ।
তাই সহিলাম—ফাল্গুনী যবে প্রতি ভুল গুণে গুণে
রোমে রোমে বিঁধে দিল অপূর্ব শরের বর্ম বুনে ।

কুরুক্ষেত্র-অবসানে দেব, আজও কি বলিতে হবে,
কৌরব ছাড়ি' কেন কুরুপতি বরে নাই পাণ্ডবে ?
কি নৈরাশ্যে রণভূমে পুনঃ বাহুতে পাইনি বল ?

দশদিন ধ'রে কেন ক'রেছিনু শুধু যুদ্ধের ছল ?
বীর্য, সত্য, মনুষ্যত্ব — সবই যদি হ'ল ফাঁকি,—
মর্ত্যে কেবল অমরতা নিয়ে কতকাল বেঁচে থাকি ?
বৃথা যৌবনে কুল-কল্যাণে ত্যজিনু রাজ্যদারা :
মিথ্যার তরে সত্য যে করে, সে হয় সত্যহারা।
পাপকে পন্থা যে দ্যায় ছেড়ে, সে লভে না ত্যাগের পুণ্য,
দেব-লীলা ফোটে মানুষ যখন মনুষ্যত্ব-শূন্য।
শিখণ্ডীপিছে পার্থ যুঝিছে,—হাসে হরি রথোপরে,
ভাগ্যে ভীষ্ম বর পেয়েছিল ইচ্ছামাত্র মরে।
তুমি কি বোঝনি কত দুখে আর স্পর্শ করিনি ধরা ?
অসহ যাতনা, তবু কেন নাই স্বর্গে যাবারও ত্বরা।
ওগো গগনের নীরব সাক্ষী। তব বংশের শেষ
দেখে যাব ব'লে শর-শয্যায় প'ড়ে আছি অনিমেষ।

আজ সব সমাপন :
বংশের সাথে হ'ল নির্বাণ ভিতরে বাহিরে রণ।
আঁধার নিশীথে তুমিও চন্দ্র চলিলে অস্তাচলে :
ভীষণ শ্মশানে শবাসনে যত শ্বাপদের আঁখি জ্বলে।
শোণিতগন্ধী মহাপ্রান্তরে ঝিমায় অন্ধ রাতি ;
দেহ খুঁজে মিছে আত্মা ভ্রমিছে জ্বালি' খদ্যোৎ-বাতি।
দিগন্তে ফুটে তোমার মৃত্যুবীভৎস মুখছবি :—
ও কি ও ! সহসা জ্বলিয়া পলকে নিবিল কি শত রবি
ঢাকে চারিধার সচল আঁধার, কল্লোল ক্রন্দন !
প্রলয়পয়োধি ভাঙে সৃষ্টির বেলা-বালু-বন্ধন !
ওকি দেখি পুনঃ ? পাণ্ডুভীষণ সে মহাপ্রলয়বারি
বটের পাতায় পার হ'তে চায় নিরুপায় কাণ্ডারী।
নারায়ণ ! একি দৃশ্য !
প্রলয়মাঝে কি বাঁচিল একাকী শর-শয্যায় ভীষ্ম !

ক্ষমা করো মোর ক্ষণিকের ঘোর হে কুলদেবতা মম !
মরণ-আহত বিহ্বলচিত ভীষ্মের ভয় ক্ষম ।
দক্ষিণপথে বিফল হইয়া, কাল হ'তে শুনেছি গো,—
উত্তরায়ণে ছুটিবে ভ্রান্ত গগন-মরুর মৃগ ।
চির-তৃষার্ত তেজ-জর্জর সেই তপনের সাথে—
জীবন ছাড়িয়া মরণ-পথের পথিক হইব প্রাতে ।
শেষবার মোর প্রণাম লহগো চন্দ্র অস্তগত,
তুমি জেনে গেলে কি শর-শয়নে মরিল দেবব্রত ।

দুঃখের কবি

আর ওরে গাল দিয়ো না বন্ধু, আজকে শীতলা ষষ্ঠী ;—
সোণার স্বরূপই ধ্যান করে মূঢ় কৃষ্ণ-কঠিন কষ্টি।
যদিও গিল্টি ও কালো ফলকে লিখে না রঙিন্ লিখা,
বুকের অতলে অপলক জ্বলে সোনার স্বপ্নশিখা।
ও নাকি শপথ ক'রেছে,—'কপালে না জুটিলে খাঁটি সোনা,
আভরণহীন কেঁদে যাক্ দিন, খাদে কভু ভুলিব না।'
কত ভালবাসে বনফুল সে যে, প্রভাতপাখীর গানে,
কত ভালবাসে রবিশশীতারা,— তারাই বুঝি তা জানে।
ভালবাসে ব'লে সবে প্রাণ খোলে, স্নেহ-লাঞ্ছনা সহে ;
যে গোপন ব্যথা কা'রে কহে না, তা' ওর কানে কানে কহে।
ওরই শিরোনামে সুগন্ধি খামে যূথিকা জানায় জ্বালা,
তাই সে কণ্ঠে পরিতে চাহে না টাটকা গোড়ের মালা।
তারার কিরণ সাঁতারিয়া আসি' কোটি ক্রোশ শীতলতা,
আত্মীয় জেনে কহে তার কানে দারুণ দাহনব্যথা।

সজল মেঘস্তরে

শুভ্র রৌদ্র রক্ত ব্যথার পশরাই খুলে ধরে।
মুমূর্ষু চাঁদে বুকে চেপে কাঁদে কৃষ্ণা বাদলরাতি ;
উপোসী রূপের অন্তঃপুরে কেঁদে জ্বলে মোমবাতি।
আপন কণ্ঠে অনুখন তার ক্রন্দন উঠে, তাই—
শত কান পাতে শোনে দিনেরাতে অফুরান্ কান্নাই।
কাঁদে ব'লে ওরে ষষ্ঠীর ভোরে গাল দিয়ে কিবা ফল ?—
কত না প্রলেপে ধরা বুকে আজও তিনভাগই লোণাজল।
সেদিনও বন্ধু মেপেছ ত তা'র অতল অশ্রুরাশি,
জান ত ঘুমায় পাতাল-তলায় কত দুর্লভ হাসি !

সাধ্যমত সে অশ্রু সেঁচিয়া, ভুলিতে ভোলাতে জ্বালা,
বিদ্রূপে বিঁধে চাহিল গাঁথিতে নিটোল হাসিরই মালা।
দুখ তার এই,—বন্দী কণ্ঠে মালা হয় বন্ধন!
কঙ্কণরূপে শৃঙ্খল আসে, হাসিরূপে ক্রন্দন!
একি যৌবন? আজ বাদে কাল করে যে জরার ঘর!
এই কি জীবন? প্রতি প্রশ্বাসে মরণে যোগায় কর!
ভক্তি প্রেম কি দণ্ডের তালে শ্রীচরণে মাথা ঠোকা?
মুক্তি কি এই? —দড়া ছিঁড়ে' ছুটে' সাকিম খোঁয়াড়ে ঢোকা?

বন্ধু, তবু সে ছাড়েনি যখন রূপরসগন্ধামি,—
সে তোমারই অনুকম্পান্বিত ছন্দানন্দস্বামী।
ক্ষম শুধু ওর যৌবনভোর প্রেমের মুক্তি চাওয়া,—
গোলাপ ধাঁধার পাকে-পাকে-কাঁদা অন্ধ গন্ধ-হাওয়া।
ক্ষমা ক'রো ওর সন্ধ্যার ঘোর, দুরূহ আকিঞ্চন,—
মরীচিকা-পান-মত্ত মৃগের আলেয়া-আলিঙ্গন।

তোহেন বন্ধু বিগড়ালো যার, কি তার গ্রহের ফের!
আছে ত জানাই যাবে প্রাণটাই টেনে বিরোধের জের!
মিছে অভুক্ত সাধের জীবন কেঁদে করে বরবাদ্,
বাঁধাদাঁতে মুড় মিটাক্ না গুড় মাংস খাবার সাধ।
ষষ্ঠীর দিনে ঠেলি' পঞ্চাশ বাসিব্যঞ্জনথালি,
ফুটায়ে দুমুঠো স্বপাক সে মিছে কুড়ায় পাড়ার গালি।
তুমিও বন্ধু রুষ্ট হ'লে যে বুঝেছি সে কোন্ দোষে,—
অন্ধ হ'য়েও ভিখ্ মাগিল না, কেমনই বা অন্ধ সে।

আমি হেঁকে চলি—-চাই ক্ষুধা চাই—
ভিড় ক'রে আসে সুধার ফাঁকি।
অমৃত-বাহিনী হায় মায়াবিনী,
ছলে বাঁধি মোরে প্রণয়-ডোরে,
আপনার বোঝা সুবহ করিতে
কার সুধা তুই পিয়াস্ মোরে ?
নূতন বোঝায় মাথা ভেরে যায়,
টলে যে চরণ, চলি কি মতে ?
অধরে অধরে ধরাধরি ক'রে
মিলনের বোঝা নামাস্ পথে।
অসীম পথের নূতন পান্থে
একে একে তুই আনিস্ ডাকি,
কচি কচি শিরে বোঝা তুলে দিস্,
আমি বিস্ময়ে চাহিয়া থাকি।
পথপাশে বসি' ক্ষণেক জিরাই,
উঠে কলরব মোদের ঘেরি'—
চাই সুধা চাই, চাই ক্ষুধা চাই—
নূতন কণ্ঠে পুরানো ফেরি!
পুনঃ কি দুরাশে তোরি পাশে পাশে
চলি মহাপথে চিরভুখারী,
হায় মায়াবিনী সুধাপসারিনী
পথিকের পথক্লিষ্টা নারী !

কৃষ্ণা

কে তাপস প্রতিহিংসা-যজ্ঞে
কৃষ্ণবর্ম্মে ঢালিল হবি ?
কন্যা কৃষ্ণা জাগিয়া বসিল
শিখা-শতদলে জন্ম লভি'।
আকাশে হইল দৈববাণী—
জতুগৃহে ওই সন্ধ্যা জ্বলিল,
সাবধান যত অসাবধানী!
অবলার দলে তুমি বলবতী
হে দেবি, আপন পুণ্যে পাপে,
আঁকিতে তোমার মর্ম্মের ছবি
ভারত-কবিরও লেখনী কাঁপে।
যুগসঞ্চিত জঞ্জাল জ্বলে
তোমাকে পরশি' হে হুতবহ!
যুগান্তরের সর্ব্ব নরের
হে নারি, স্তব্ধ প্রণাম লহ।
শুনিল যে দিন এই ভারতের
উন্ধতশির ক্ষত্র সবে
তোমারে লভিতে হেঁটমুখে রহি'
আকাশে লক্ষ্য বিঁধিতে হবে,
এল দলে দলে অযুত নৃপতি
স্বয়ংম্বরের সে সভাতলে,
তুমি দিলে মালা— চীরবাসে ঢাকা
লক্ষ্যবেধা ভিখারী-গলে।

অসহ তাহার বহনের ভার—
নামাতে যে চাহি অহর্নিশা।
কোন্ গহনের মধুপের পাঁতি
মোর আঁখি হ'তে উড়িয়া চলে ?
গুঞ্জরে তারা তব মালঞ্চে
তোমার অচেনা পুষ্পদলে।
কোন্ অশোকের চৈতী ঝরণ
ও কপোল-তলে শুকায়ে উঠে ?
কোন্ পঙ্কের পঙ্কজকলি
গরবী উরসে ফুটিয়া টুটে ?
কোন্ শেফালির একটি রাতের
দীপালি নিবিছে ওষ্ঠাধরে !
কোন্ বকুলের একটি বাদল
ওই কেশপাশে ঝুরিয়া ঝরে !
এবারের মত শিহর ভুলিছে
কোন্ কদম্ব ও-রোমকূপে !
এবারের মত ফুলন ফুরায়
কোন্ চম্পক তোমার রূপে ?
কোন্ কুহকীর কুহু কুহু কুহু
ভেঙে আসে তব কণ্ঠ-আড়ে !
কোন্ সে চাঁদের মধু পূর্ণিমা
ভোর হয়ে যায় ও-তনুপারে !
অজানা মধুপ, তারই তৃষাতরে
বহ সাথি কার গন্ধশোভা ?
তাই বার বার কুঞ্জে তোমার
বসে আর ভাঙে পুষ্পসভা।

অমন করিয়া চেয়োনাকো সখি
কাঁপায়ে চোখের সজল পাতা,
দুটি বাহু দিয়া কণ্ঠ বাঁধিয়া
বঞ্চিত বুকে রেখো না মাথা।
তনু হ'তে তনু, দীপ হ'তে দীপ,
যে অতনু শিখা জ্বলিছে চির,
আমার বুকের জতুগৃহে তুমি
সেই দীপ আজও জ্বালায়ে ফির।
আমার বুকের জতুগৃহখানি
রচিত না জানি কাহার স্নেহে,
এ স্নেহের ভার এ দীপের হার
ধরি দিব বল কাহার দেহে?

আমরা দু'জনে চলেছি বহিয়া
অনাদি যুগের অনেক বোঝা,
অসীমপুরের রাজপথে পথে
ফেরি হেঁকে হেঁকে গাহক খোঁজা।
তোমার মাথায় সুধার পশরা,
আমার মাথায় ক্ষুধার ডালা,
ক্ষুধায় সুধায় পাশাপাশি, তবু
নিবাতে পারিনে এ ওর জ্বালা।
তোমার পশরা রূপে রসে গানে
ভরা আছে যেন ফুলের ডালি
আমার পশরা রয়েছে বোঝাই
ক্ষুধাতৃষ্ণায় অনাদি কালই।
হেঁকে চল তুমি চাই সুধা চাই—
ঘরে ঘরে ফুটে তৃষিত আঁখি,

সে হ'তে বন্ধু হায় !

এমন ঠাণ্ডা বাদল রাতেও জেগে ব'সে আছি ঠায় !
বনের বেদনা পথে বিকাইছে, — কি মোর কপাল ভোগ,—
গন্ধের লোভে কিনে এনে ঘরে ধরে অনিদ্রারোগ !
চোখে মুখে গায়ে কে যেন মাথায়ে দিয়েছে লঙ্কাবাটা ।
বুকে ফুটে আছে কেয়ার গন্ধ, হাতে ফুটে আছে কাঁটা ।
বাহিরের জ্বালা জ্বালায় ভিতর, ভিতর জ্বালায় বা'র,—
—জ্বলে স্তম্ভিত বিদ্যুৎ-বাতি পথে পথে সারে সার ।

ওগো জাগরণ-সাথী

কখন কাটিবে অনিদ্-রাতি এ, নিবিবে পথের বাতি ?
রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘুমায় যামিনী, আমি কান পেতে থাকি,
যদি ডেকে উঠে অরুণ-বিহীন ভোরের করুণ পাখী ।
ঘুম ঘুম ঘুম,—কোথায় বা ঘুম ? হায় গো বন্ধু হায় !
বাদল মেঘেতে অস্ত-চাঁদের আদল কি দেখা যায় ?
নয়নের নিদ্ নয়নে রুধিতে আঁখিপাত মুদি মিছে,—
অন্ধ আকাশে উড়েছে সে কেয়াগন্ধের পিছে পিছে ।
পথে পথে রাতে এই বর্ষাতে তুমিও যে ঘোর' ভাই,
তোমারেও তবে ধ'রেছে বন্ধু আমারই অনিদ্রাই !
মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন্ কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা ?

বোঝা

কার কৈশোরে কিশোরী হইয়া
আমারে প্রথম ভুলালে প্রিয়া ?
যৌবন-যোগে দেখা দিলে ফিরে
কার কৈশোর কাহারে দিয়া ?
কার যৌবনে ঢেকে এলে তনু ?
আজি তাও পুনঃ কে লয় টানি' ?
যা নহে তোমার তাই দিতে মোরে
কেন চিরদিন প্রয়াস রানী !
আজি নিশিশেষে ব'সে মুখোমুখি
নব পরিচয় দু'জনে লব।
নূতন করিয়া গুণ্ঠন তুলি'
মিলাব নয়ন নয়নে তব।
আদি যুগ হ'তে যত কটাক্ষ
নীল পাখা মেলি' আকাশে উড়ে,
তব অপাঙ্গে বারেক নামিয়া
ক্লান্তি মিটায়ে গেল কি ঘুরে ?

যুগসঞ্চিত চুম্বন ভারে
শ্রান্ত আনত অধর তব,
ভেবেছিলে সখি, তোমার সে ভার
আমার অধরে পাতিয়া লব।
হায় সখি হায়, আমার অধরে
উছলিয়া পড়ে এ কার তৃষা !

কেতকী

এ বাদলরাতে কেন গো বন্ধু আমার শয়নঘরে ?
মোর মত কি গো নিদ্ নামিল না তোমারও নয়ন-'পরে ?
বাহিরে সহরে কাঁদিছে বরষা, ভিতরে ব'স গো ভাই !
আব্‌ছা আঁধারে শোনাই তোমারে কেন চোখে ঘুম নাই ।
সহরের মাঝে নামিল পশলা, সাঁঝে ফিরিতেছি বাসা,
দেখিতে দেখিতে রাজপথে পথে জল জমে' গেল খাসা ।
বৌবাজারের মোড়ে, —
যেখানে ফুলের দোকানের পাশে কসাইয়ে মাংস থোড়ে,
যে চৌমাথায় মাথা ঘুরে যায়, পা পায় না খুঁজে পথ,
যেথা যাবতীয় রথের সারথি বারেক থামায় রথ,
যেখানে বন্ধু, — থাক বর্ণনা আসল কথাই কহি,—
পৌঁছিয়ে সেথা সহসা কি ব্যথা উঠে যেন বুক বহি' !
বাদল-মাথায় দাঁড়ানু ক্ষণেক,—ঘুচিল মনের সন্দ,—
আমার বুকের ব্যথা নহে, এ-ত বন-কেতকীর গন্ধ !
ইতি উতি চাহি' পড়িল নয়নে, ঝুড়ির উপর উচ্চ
মালীর মাথায় কুড়ি দুই দেড় কেয়া-কুসুমের গুচ্ছ ।
আসি' কাছাকাছি ওরই মাঝে বাছি' কিনে ফুল তাড়াতাড়ি
বর্ষার সাঁঝে আগাগোড়া ভিজে' খুসি মনে এনু বাড়ী ।
শয়নঘরের হুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে ।

বাহিরে তখনো ঝরিছে বর্ষা, থেকে থেকে ডাকে দেয়া,
ভিতরে আমার শয়ন-শিয়রে গন্ধ ছড়ায় কেয়া ।

রাত দু'পহর, স্তব্ধ সহর, কাঁদে নিশি নিশ্চন্দ্রা,
কেতকী-গন্ধে কত কি ভাবিতে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা।
······কে জানে সে কোন্ বনে,
কাঁটার আড়ালে উঠেছিল ফুটে আঁধারে সংগোপনে!
শ্যামপাতে ঢাকা শ্বেত কিশলয়, তাহে ঢাকা পীত-রেণু,
শ্রাবণ-সোহাগে যৌবন জাগে বাজে গন্ধের বেণু।
এল বায়ুরথে মত্ত ভ্রমর নূতন মধুর লোভে,
তরুমূলবাসী বিষভুজঙ্গ ফণা তুলে ফোঁসে ক্ষোভে।
বাদল দারুণ বিধি অকরুণ—কি হ'তে কি হ'ল হায়!
গন্ধ ধরিয়া সহরের মালী গ্রাম ছেড়ে বনে যায়।
উড়ায়ে ভ্রমর মারি' বিষধর সহরের পাকা মালী
বৌবাজারের মোড়ে বিকাইতে কেয়ায় ভরিল ডালি।
তারি মাঝে যারে বাছিয়া আদরে আমি আনিলাম ঘরে,
এ বাদল রাতি যারে করি' সাথী কাটাই কাব্যভরে,
যার গন্ধের আনন্দে মোর নয়নে তন্দ্রা লাগে,—
না জানি কি দুখে সে তরুণ বুকে মরণের লোভ জাগে!
আধঘুমে চাহি' দেখিনু চমকি'—ঝুলিছে সব নাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি,—
কসিয়া কোমর বাঁধা,
অলকগুচ্ছে আধঢাকা মুখ অস্বাভাবিক সাদা!
তোমারই শপথ, কহিনু সত্য,—দেখিলাম প্রাণবন্ধো!
দেয়াল ধরিয়া বেড়াইছে ঘুরে মৃত কেতকীর গন্ধ!
হাঁকিল পাহারা, উঠি' ধড়মড়ি দু'হাতে খসানু ফাঁসি
ঝর ঝর ভুঁয়ে ঝরিয়া পড়িল শুষ্ক পরাগরাশি!
কাঁটা বিঁধে হাতে বুঝিনু,—স্বপন, আমারই মনের ভুল;
দুপ'র রাতের ঘুম মাটি করে দু'পইসে কেয়াফুল!

মন্দির ছাড়ি' দাঁড়ালে দুয়ারে
চাহিয়া সে শীত নিশীথ-নভে,—
দূরে দূরে যারা জ্বলিছে নীরবে
হাতছানি তারা দিল কি সবে ?
বাহিরিলে মহাপথে হে তাপসি,
ললাটে লিখিয়া কিসের লিখা ?
বিশ্বনারীর লাঞ্ছনা, না ও
যজ্ঞশেষের ভস্মটীকা ?

বহুযুগান্তে গগনপ্রান্তে
যুগের শঙ্খ বাজিছে ওকি !
তোমারে জাগাতে কে জ্বালে অনল
হে কৃষ্ণা, অয়ি কৃষ্ণ সখি !

বেদিনী

ফাগুন আকাশে নামে কাল-সাঁঝ
ঝোড়ো মেঘে দিক্ ঘেরা,
ওঠ্‌রে বেদিনী মোট বেঁধে নিই
তুলিতে হইবে ডেরা।
দখিনার লোভে খোলা মাঠে তুই
বসালি তাঁবুর খোঁটা,
ভাঙা ফাটা ফুটো তৈজস গুটো,
সাপের ঝাঁপিটে ওঠা।
ফাগুন হাওয়া এ নয় রে বেদিনী,
দখিন হাওয়া এ নয়,
ঈশান কোণের ফণীর ফণায়
বিষের নিশাস বয়।
ওই আসে সেই ঝড়,—
ওঠ্‌রে বেদিনী, মোট তুলে নিয়ে
বেদিয়ার হাত ধর্।

কি হ'ল বেদিনী তোর?
উড়ো মেঘে রাখি' নিশ্চল আঁখি
কোন্ বেদনায় ভোর?
এবার সহসা উঠাইতে বাসা
কেমন করে কি মন?
মাঠে মাঠে আর ঘাটে ঘাটে ঘুরে
ক্লান্ত কি এ জীবন?

ঘুরে যায় চাকা, দূরে যায় দেখা—
প্রলয়-শীর্ষে ছুটেছ রাণি !
পাঁচতুরঙ্গী মনোরথে তব
পাঁচ অঙ্গুলে বল্গা টানি ।
অক্ষৌহিণী অক্ষৌহিণী
কুরুক্ষেত্রে বাহিনী পড়ে,
পড়িল ভীষ্ম, পুড়ে গেল দ্রোণ,
ডুবিল আরুণি, শল্য মরে ।
মরে কুরু, মরে পাণ্ডবদল,
মরে পাঞ্চাল নির্বিচারে,
বালকেরে ঘিরে মারে সাত বীরে,
নিবারণ সেথা কে করে কারে ?
সেই নরমেধে যজ্ঞ-অগ্নি
জ্বলিতেছ তুমি যাজ্ঞসেনী,
উড়াইয়া শিরে শিখার শিখরে
পুঞ্জধূমের মুক্তবেণী ।
যত নারী যেথা হ'ল লাঞ্ছিতা,
প্রায়শ্চিত্ত করিল কুরু—
রক্তসন্ধ্যা গড়ায় আকাশে
কে লুটে আঁধারে ভগ্ন-উরু !
তবু কোথা শেষ ? পঞ্চপুত্র
মরিল গুপ্ত-ঘাতক-করে—
কাঁদে ফাল্গুনি কাঁদে বৃকোদর,
তব চোখে শুধু অগ্নি ক্ষরে ।
তুমি শুনেছিলে—ব্রাহ্মণাধম
মৃত্যুরে নাকি দিয়েছে ফাঁকি,

তাই তব করে মৃত্যু-অধিক
শাস্তি তাহার র'য়েছে বাকি।
দিলে অনুমতি—"নরসর্পের
লাঞ্ছিত শির খড়্গে চিরে'
মিলে যদি মণি আনিবে এখনি,
উপহার দিব যুধিষ্ঠিরে।"
ক্ষতশির সেই অশ্বত্থামা
আজও ছোটে শূন্য মাটির তলে,
অমর তাহার দেহদীপাধারে
কি অনির্বাণ মরণ জ্বলে।

ভারতের নর নিঃশেষ যবে
নারীমর্যাদা প্রতিষ্ঠিতে.
কে জানে সেদিন কোন ব্যথা নারি,
জেগেছিল কিনা তোমার চিতে।
সেই সন্ধ্যায় ফিরিলে যখন
শূন্য তোমার দেউল-তলে,—
কোথা ধূপমালা, উপচার-থালা ?
শুধু সে পঞ্চপ্রদীপ জ্বলে।
ম্রিয়মাণ তার পাণ্ডুর ভাতি
কাঁপে মন্দির-অন্ধকারে,
হবিভারে হোমকুণ্ডের শিখা
মূর্ছিত পাশে ভস্ম-আড়ে।
সে প্রদীপে আর সহে না আরতি,
সে অনলে আর বহে না হুত,
বাহিরে ঘনায় অকূল রাত্রি
নিখিল নারীর অশ্রুপ্লুত।

রাজসূয়ে যারা ক'রেছিল রানী,
জুয়া হারি' তোমা বেচিল তারা
হে শিখারূপিনী ! না জানি কেমনে
সেদিন হওনি ধৈর্য্যহারা ।
মর্মান্তিক জাগরণে জাগি'
ফুটিল কি মুখে কুটিল হাসি ?
শুনিলে যখন আজ হ'তে তুমি
নূতন রাজার পুরানো দাসী ?
দম্ভস্ফীত সে রাজশাসন
কটি হ'তে তব বসন টানে,—
হুতাশন হ'তে হুতাশনশিখা
গতাসু বিনা কে ছিনায়ে আনে ?
পুরুষের মাঝে বিবস্ত্রা তুমি,
ধর্মমেষেরা শাস্ত্র ভাবে !
পুরুষ ছিল কি সেই সভাতলে
যারে দেখে তুমি লজ্জা পাবে ?
শুধু বুঝে নিলে নরের রাজ্যে
কত নিরুপায় নিখিল নারী,
প্রমোদ-রাতে ও রাজার সভাতে
রহিল সমান প্রমাণ তারি ।
সেদিন সহসা দিব্যদৃষ্টি
ফুটিল তোমার নয়ন-পাতে,
দেখিলে চাহিয়া কোন ভেদ নাই
যুধিষ্ঠিরের শকুনি সাথে ।
কর্ণে পার্থে কি পার্থক্য ?
কি ভেদ দ্রোণে ও দৌবারিকে ?

ধর্ম সে শুধু নরের জন্য
ফিরেও চাহে না নারীর দিকে।
দুঃশাসনেরই স্বজাতি ভীষ্ম
মর্মে সেদিন বুঝিলে মা তা'—
ক্রূর নগ্নোরু দুর্যোধন যে
বিমূঢ় গদায় ভীমেরই ভ্রাতা !
সেদিন আকাশে লিখে দিলে পণ
ক্ষণকটাক্ষে বজ্রভরা,—
নরশূন্য না করিলে কখনো
নারীর যোগ্য হবে না ধরা।
তব চক্ষের বিদ্যুজ্জ্বালা
কৃষ্ণ মেঘের বক্ষে ফুটে ;
দিক্‌চক্রে কি ঘূর্ণি জাগিল ?
সারা অম্বর চরণে লুটে !

বর্ষাবারিত দাবাগ্নি সম
ভ্রম' বনে বনে মৌনমুখী,
সহিয়া নারীর সহজ গর্বে
নারীজীবনের সর্বদুখই।
হীন পরিচয়ে কাটে কতদিন
বিরাটের হীনা রাণীর ঘরে,
কামান্ধ পশু রাজার সভায়
বাম পদে তোমা প্রহার করে।
ঘরে কি বাহিরে, হে বহ্নিশিখা,
যেথা জ্বলিয়াছ সুখে কি দুখে
পতঙ্গ-সম যত লাঞ্ছনা
ঝাঁপায়ে পড়ে কি তোমারি বুকে !

অপরিচিতের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে
নির্ভয়ে নারি, হেরিলে তুমি—
যত কাপুরুষ রাজার রক্তে
রঞ্জিত হ'ল পিতৃভূমি।
জগন্নাথের শঙ্খ ধ্বনিল
তব ভিখারীর শ্রবণমূলে,
স্বর্গ হইতে বাণে ভরা তূণ
নেমে এসে তার পৃষ্ঠে দুলে!
তব দয়িতের ছদ্ম বীর্যে
বিস্মিত হল বিশ্ববাসী,
তুমি বিস্মিত হয়েছিলে কিনা—
সে কথা জানে না বেদব্যাসই।

ভিখারীর সাথে ফিরিয়া কুটীরে
শুনিলে—তোমার পঞ্চ পতি!
নিশীথ ঝিল্লী থামিল কাননে,—
বিকার বিহীন তুমি গো সতী।
তুমি যে জানিতে—কে আছে পুরুষ
একা ধরে তব পূর্ণ পাণি?
উঠেছ অনলে নারীর গর্বে
নারীর গর্ব তুচ্ছ মানি'।
বিবাহ-আসনে বামাঙ্গুষ্ঠ
দিলে তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরে,
তর্জনী তুলি' দিলে বৃকোদরে,
মধ্যমা, হাসি' পার্থ বীরে,
ঈষৎ নামায়ে দিলে অনামিকা—
ধরিল নকুল হৃষ্ট মনে,

কনিষ্ঠা তব পরশ করিয়া
সহদেব স্বীয় ভাগ্য গণে।
পাঁজি পুঁথি ল'য়ে খুঁজে মুনিগন
সতীর পঞ্চপতির হেতু,
কল্পনা গাঁথি জন্ম হইতে
জন্মান্তরে বাঁধিল সেতু।
কেহ বলে তুমি তপস্যান্তে
পাঁচবার পতি চাহিয়াছিলে,
ভাংখোর ভোলা দিল পাঁচ বর,
তাই পাঁচ পতি ভাগ্যে মিলে।
কেহ বলে তুমি অন্য জন্মে
স্বামী লাগি পুনঃ বসিলে তপে,
পঞ্চদেবতা আসি' একসাথে
তোমারে তাদের হৃদয় সঁপে!
সে সব কাহিনী জানি বা না জানি
তেজস্বিনী গো তোমারে চিনি,
আপন-যোগ্য পুরুষ সৃজিতে
জন্মে জন্মে তপস্বিনী।
দেবতারা মিলে গড়িতে পারেনি
তোমার প্রাপ্য তপের নিধি।
তাই গো সাধিত্র পঞ্চ প্রদীপে
তোমারে আরতি করিল বিধি।
মাটির গর্ভে জন্মে যে সতী,
সে দিল পরখ অনলে পশি ;—
অনলকুণ্ডে জন্মিল যে বা,
তার সতীত্ব কোথায় কষি' ?

বেদিয়ার বালা সাধিয়া দিল যে
বেদিয়ার গলে মালা,
জানিতিস্ তুই এদের বংশে
নাই যে ঘরের জ্বালা।
বেদের ধারা ত বুঝিস্ বেদিনী,—
যে ঘর বাঁধে সে দিনে
রাত না পোহাতে চিহ্ন তাহার
ঢেকে যায় শ্যাম তৃণে।
তবে বা কিসের লাগি
এত কাল পরে হ'লি তুই আজ
সেই ঘরে অনুরাগী ?

বেলায় বেলায় পথের খেলায়
বেদিনী রে কাটে দিন,
আমাদের 'পরে পথের কুকুর-ও
নহে কভু উদাসীন।
সিক্ত মাটির শীতল-পাটিতে,
মাথায় সাপের ঝাঁপি,
কত না রজনী কাটালি বেদিনী,
ভরা বুকে ধুক চাপি'।
তুই আর আমি পথে পথে ভ্রমি
সাথে শততালি ঘর,
ঝাঁপির ভিতরে কালভুজঙ্গী
চিরসাথী শির'পর।
এ সবে কি রুচি নাই ?
ঘরের মায়ায় ঝড়ের আকাশে
নয়ন মেলিলি তাই ?

বেদের আদরে বেদিনী রে তোর
চুলে বাঁধিয়াছে জট,
তারি সোহাগের ভাঙনে ভেঙেছে
শ্যামল তনুর তট।
ফাগুন পবনে ঘুরি' বনে বনে
হাতে ছাগলের দড়ি
বেছে বেছে তার মুখে তুলে দিস্
ফুলে ভরা বল্লরী।
গোপনে ছোপানো হৃদয় হইতে
ছিঁড়িয়া রঙিন ফালি
চির-হাঘোরের ঘরণী রে তুই
ঘাঘ্‌রায় দিস্ তালি।
তবু যে বেদিনী বেদেরি ভক্ত—
বিস্ময় সবে মানে.
গুরুর কৃপায় বেদেরা যে হায়
মোহিনী মন্ত্র জানে।

শোন্-রে বেদিনী শোন্
শুরু হ'ল ওই অদূরে আঁধারে
গুরু গুরু গর্জন!
ঘরের মায়া সে থাকে ত এখনও
কেটে দে তাঁবুর রসি.
না হয় কাটাব এ কালরাত্রি
খোলা মাঠে খাড়া বসি'।
আকাশ জুড়িয়া কোন্ সাপুড়িয়া
বাজায়ে চলেছে তুরী,

ঝাঁপির ভিতরে জাগিয়া সাপিনী
    ভাঙিতেছে মোড়ামুড়ি।
ভেবেছে সে আজ এল নটরাজ,
    নৃত্যের আহ্বান,
ডালার রসির ফাঁসে ওই দ্যাখ্
    ঘন ঘন পড়ে টান।

কেন উদাসীন আনমনা হেন
    বেদিনী, বেদের মেয়ে?
দূরের বাঁশীর সুরে তুইও কি রে
    উঠিবি কাঁদুনি গেয়ে?

অকালে এল এ কালবৈশাখী
    কাছে আয় কাছে আয়,
যাহা নাই তারি মায়ায় বেদিনী
    যা ছিল তাও যে যায়।
ছুটে যায় খুঁটো, উড়ে ছেঁড়া তাঁবু
    টুটে যায় দড়াদড়ি,
ফুটো ভাঁড় আর কানাভাঙা হাঁড়ি,
    দূরে দূরে গড়াগড়ি।
অকালের এই কালবৈশাখী—
    ভেঙে দিল তোর ঘর,
সাপের ঝাঁপিটে মাথায় চাপিয়ে
    বেদিনী রে হাত ধর।
ঝড়ে ঘর ওড়ে, মাঠ ত ওড়ে না—
    ভয় নাই ভয় নাই,

এ মাঠ ছাড়িয়া চলরে বেদিনী
আর কোন মাঠে যাই।
হাওয়ার উজানে দিক্ ঠিক রেখে
আঁধারে আঁধারে চল্—
আকাশে খেলায় লয়া লয়া মাপ
পারের সাপুড়ে দল।
কি ভাবিস্ মিছে আয় পিছে পিছে
যা হবার তাই হোক্—
বেদে বেদিনীরা ভয় পায় যদি—
হাসিবে গাঁয়ের লোক।

মন্ত্রহীন

হে আমার জ্যোতি,   হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
বয়স মোদের   হ'য়ে গেল ঢের
পারে যাব কোন্ পাথেয় নিয়া ?
কাশী গয়া দূর,   এইত বেলুড়,
তাই বা সেখানে গেলাম কবে ?
আকাশ এদিকে   হ'য়ে এল ফিকে
সাধুসঙ্গ সে কবে বা হবে ?
দুঃখ তোমার   পঞ্চাশ পার,—
তবুও দীক্ষা নিইনি আমি,
শাস্ত্রে স্থির   আছে নাকি, স্ত্রীর
হয় না মন্ত্র না নিলে স্বামী।
আপনি মজিনু   তোমা মজাইনু,
ক্ষমা কর মোরে মমতাময়ী,
ছুটির বেলায়   আজীবন ত্রুটি
সেরে নিব তার সময় বা কই ?

তবু শোন সতি,   গোপনীয় অতি
কহি আজ কিছু আশার কথা,
তোমার পতি যে   মন্ত্র নেয় নি
শুনেছ যা, নহে যথার্থ তা।
আমার মন্ত্র   জন্ম অবধি
আমারে ঘেরিয়া ঘুরিতেছিল,

তব মুখ হ'তে আমার দেবতা
সে মন্ত্র মোর শ্রবণে দিল।
সেই দিন হ'তে ওই তনু মাঝে
তনু হারাইল দেবতা মম,
জপি আমি নাম— হে আমার কাম,
হে আমার প্রেম, হে প্রিয়তম !
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
তোমারই তনুর ঝর্‌না-ধারায়
আজও সুশীতল আমার হিয়া।
তারই গৌরবে গরবী যে আমি,
তারই দানে ধনী করেছে যে সে,
পলাশের ঝরা পলাশে যেমন
পলাশের তলা চৈত্রশেষে।
তাহারই পরশ অমৃত-সরস,
দরশ তাহার নয়ন-রম,
সে তনু নোয়ায়ে তুমি প্রণমিলে
মনে মনে বলি—নমো হে নম,
নমো নমো নম সুন্দরতম
আমার প্রিয়ার মোহন দেহ,
যুগে যুগে দেয় পরমানন্দ,
নরকের দ্বার ব'লো না কেহ।
বালগোপালের ধাত্রী ও-দেহ,
ধরা দিল মোর বাহুর পাশে,
ক্ষীর-সায়রের ওই তরঙ্গে
কত চাঁদ মুখ ভাসিয়া আসে।

দেবতা আমার ভিখারী হইল
ওই ফুলে পূজা পাবার লোভে,
ওরই রসায়নে অতনু মদন
মদনমোহন মূরতি লভে।
ও-তনু আমার হেম-ধূপাধার,
রূপানল বহ্নি জাগিয়া থাকে,
মুঠা মুঠা মোর কামনা পুড়ায়ে
মন্দিরখানি সুরভি রাখে।

প্রিয়ার তনুর অণু-পারাবারে
তরঙ্গময় তড়িৎ নাচে,
সেথা ফুটে উঠে যে লীলাপদ্ম,
আমার দেবতা তাহাই যাচে।
ও-তনু পুড়িবে ভস্ম উড়িবে,
সে কথা আমার অজানা নহে,
বুকে রেখে তারে চোখে আসে জল,
তনু চুপে চুপে আমারে কহে ;—
আমি-ই আমার লীলাতরঙ্গে
গোপনে আপনা ভাঙি ও গড়ি,
সে ভাঙা-গড়ায় যে 'আছে' রয়েছে
সে থাকারে 'নাই' কেমনে করি ?
শুধু ছল ক'রে লুকাই বন্ধু,
কত কাঁদ তাই দেখিব ব'লে,
কত কেঁদেছিনু সে কথা কহিতে
ফিরে ফিরে আসি তোমারি কোলে।
আছি আছি আমি, আছ আছ তুমি,
আমি প্রিয়া আর তুমি যে প্রিয়,

আমার এ রাঙা চেলীর প্রান্তে
বাঁধা আছে তব উত্তরীয় ।
যা ছিল আমার সঁপেছি চরণে
বসন ভূষণ সরম মম,
এবারের এই তনুর লীলায়
পেলে কি তৃপ্তি হে প্রিয়তম ?
হে আমার জ্যোতি, হে আমার সতি,
গৃহিণি, সচিব, সখি হে প্রিয়া,
যে মন্ত্র তুমি কহ কানে কানে
আমার মুক্তি তাহাই দিয়া ।
আমার গুরুর উপবীত নাই,
কণ্ঠে তাহার কনক-হার ;
শিরে নাই শিখা নাই জটা-জুট,
আছে বেণী আছে অলক-ভার ।
কপালে নাহিক ত্রিপুণ্ড্র-রেখা,
সিঁদুরের টিপ্ পরে সে ভালে ।
তা ব'লে শাস্ত্র- সম্মত কিগো
ত্যাগ করা গুরু প্রৌঢ় কালে ?
তদুপরি শোন আমার মতন
গুরুর ভাগ্য করিল কেবা ?
রাতে দেয় কানে মুক্তিমন্ত্র
দিনে করে মোর চরণ সেবা ।
ধার দিয়ে তার তনুবীক্ষণ
বিশ্বরূপ সে দেখায় মোরে,
বিস্ময়ে হেরি, তারি রূপ ঘেরি'
আমার রূপের জগৎ ঘোরে ।

পরশিয়া নীর বৈতরণীর
সহধর্মিণী শপথ করি—
এ নহে সত্য— নাস্তিক, তাই
মন্ত্রবিহীন জীবন ধরি ।
বৃন্দাবনের চিরসুন্দরে
ডুবিতে দেখেছি ও-রূপদহে,
তারে খুঁজে তাই সাঁতারি' বেড়াই,
বিশ্বাস নাই সকলে কহে । .
তোমারি মিলন- আস্বাদে মম
তাহারি বিরহ হৃদয়ে জাগে,
কত কটু তারে কহি বারে বারে,
কভু অনুরাগে, কখনো রাগে ।
বন্ধু, বন্ধু, হৃদয়বন্ধু,
কেঁদে কেঁদে তারে কত যে ডাকি,
দুখের বাঁশরী বাজায় সে শুধু
সকল সুখের আড়ালে থাকি' ।
সেই সুন্দর মম মনোহর
ধরা দিতে এসে দিল না ধরা, —
তবে আর সখি মিছে কেন যত
শুকনো পুঁথির মন্ত্র পড়া ?
অশ্রুতে গাঁথা না পাওয়ার ব্যথা,
সেই মালা জপি দুজনে মিলে,
এস মোর জ্যোতি, এস মোর সতি,
মন্ত্র এবার নাই বা নিলে ।

আমার হাতের তড়িতের হার উঠিবে কি বুকে ঝলি?
চরণ পাতিয়া লবে সে আমার আগুনের অঞ্জলি?
সখা ব'লে সে কি বাড়াইয়া দিবে লুব্ধ শিখার কর?
ললাটবহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্বে গরবী করিবে মোরে?
এই ধরণীর পঙ্কপিণ্ড নিম্নে থাকিবে প'ড়ে?
আজও কি রাখিব আশা?
যে মহামরুরে ভালবাসি আমি, পাব তার ভালবাসা?
বন্ধু হাসিছ তুমি,—
ভালবাসা যদি ফিরে দেয় তবে কিসের সে মরুভূমি?
খুব খাঁটি কথা, গাহি তবে আমি— আনন্দ কি আনন্দ,
রাতের চন্দ্র গ্রহণ লাগিতে দিনের অফিস বন্ধ!

কচি ডাব

'ডাব চাই, ডাব, কচি ডাব ?
আমার বাসার ধারে
হাঁকে বৃদ্ধ ঝাঁকা ঘাড়ে,
সে পথে এখন লোকাভাব ।

অঘ্রাণের শীত-সন্ধ্যা
শ্বাসরোধী ধূম্রগন্ধা
চাপিয়াছে শহরের বুকে,
হিমাঙ্গ উত্তর বায়
হাঁপের টানের প্রায়
থেকে থেকে গলিটায় ফোঁকে ।

হাঁকে বৃদ্ধ 'ডাব, কচি ডাব ?'
পাগল ! আজি এ সাঁঝে
সংকীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব ;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব ?

কাঁদিয়া কহিল বুড়া—
'তুমি মোর বাপ খুড়া,
ঝাঁকাটায় হাত যদি দাও,

বারেক নামায়ে বোঝা
মাজাটা করিব সোজা,
ডাব তুমি নাও বা না নাও।'

বাহিরিয়া দ্বার খুলি'
দু'হাত ঝাঁকায় তুলি'
নামাইয়া দিনু তার ভার ;
ব'সে পড়ি ভাঙা ধাপে
থর থর বুড়া কাঁপে,
নগ্ন বুকে নুয়ে পড়ে ঘাড়।

ক্ষণেক নীরব থাকি'
ক্ষীণকণ্ঠে মোরে ডাকি'
কহে বৃদ্ধ - তবে বাবু যাই ;—
ডাব ক'টি নামাইয়া
ন্যায্য দাম হাতে দিয়া
আমি তার মুখপানে চাই।

গণ্ড ভরি' আঁখি-নীরে
খালি ঝাঁকা তুলি' শিরে
গলি বেয়ে চলি গেল বুড়া,
ঘরে ঢুকি দ্বার রুধি'
অন্ধকারে চক্ষু মুদি'
কোলে তুলে নিয়ে তানপুরা।

বেসুরে ধরিনু গান,—
হায়, হত ভগবান্ !
মোর ভাগ্যে এহেন দুর্ভোগ !

অপরের কাব্যভালে
মিলাও ত কালে কালে
অনুকূল কত-না সুযোগ !

সে-সব কবির বেলা,—
শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলা,
দুয়ারে তরুণী পসারিনী,
তনুদেহে সিক্তবাস,
নয়নে মিনতি-ফাঁস,
ফুল নিয়ে করে বিকিকিনি।

আরো ভাগ্যবান যিনি
আসে তাঁর পসারিনী
কোমল করুণ ক্লান্তবায়,
'শয্যা শুভ্রফেননিভ
স্বহস্তে পাতিয়া দিব'
সাধে কবি সমবেদনায়।

এ ভালে তেঁতুল-গোলা—
অতি বৃদ্ধ ডাবগুলো।
তাও নহে বৈশাখী দুপুরে :
মিটাতে প্রাক্তন দেনা
শীতরাত্রে ডাব কেনা !
তাই কি কাটারি আছে ধরে

সহসা ঝনাক্ ঝান্
তানপুরে কাটে তান,
ছিঁড়ে গেল সব কটা তার :

আমার শ্রবণ-মূলে
অকস্মাৎ গেল দুলে'
কোন্ রুদ্র নৃত্যের ঝঙ্কার।

দারুণ শীতের সাঁঝ,
হে আমার নটরাজ,
কোন্ রূপে এসেছিল দ্বারে?
অশ্রুর সাগরমন্থ
হে আমার নীলকণ্ঠ!
ভাগ্যে ফিরাইনি একেবারে।

শীতাতপে দিগম্বর,
দিশাহীন পথচর,
দেহ টলে ক্ষুধার নেশায়:
অন্তর-শ্মশানে চিতা
সারি সারি নির্বাপিতা,
তাহারই বিভূতি ফুটে গায়।

সর্বাঙ্গে হাড়ের মালা,
শিরায় ফণীর জ্বালা,
গণ্ডে ঝরে জাহ্নবী উতলা!
কৃষ্ণাচতুর্দশী-শেষে
তোমারি ললাটে এসে
অস্ত গেছে শেষ শশীকলা!

তোমার মাথার ভার,
ধরেছি যে একবার,
তাহে মোর মিটিয়াছে সাধ।

দিয়েছি তামার চাকি,—
সে মোর হয়নি ফাঁকি,
সোনায় ঘটিত অপরাধ।

যে মোহিনী স্বর্ণটাটে
পাতে পাতে সুধা বাঁটে,
সে যাদের করে প্রবঞ্চনা,
হে মোর বঞ্চিতরাজ,
নিঃশেষে বুঝেছি আজ
আমি যে তাদেরই একজনা।

তাই তুমি নানা ছলে
আমার অন্তরতলে,
আমার দুয়ারে আঙিনায়

ঘুরিয়া ঘুরিয়া আস,
কাঁদি ব'লে ভালবাস,
মোর অশ্রু তোমারে কাঁদায়।

তোমার প্রসাদকামী
স্বর্গ্‌হে সন্ন্যাসী আমি,
এ জীবন নিষ্ফলে সফল—
অনাদি দুঃখের স্রোতে
তোমারি নয়ন হ'তে
ঝরে'-পড়া একফোঁটা জল।

কৃষ্ণা চতুর্দশী

কে কাঁদে অন্তরে মোর ?
গগনে ঘনায় ঘোর
শ্রাবণের রাতি।
পথ চলি কি সাহসে
মৃত মুখ মৃদু হেসে
সাথে হয় সাথী।

জড়ায়ে জরার কাঁথা
সঙ্গোপনে তোলে মাথা
অতৃপ্ত যৌবন,
কালো পাথরের কানে
কবোষ্ণ স্বপন আনে
উষ্ণ প্রস্রবন।

মন্দাক্রান্তা মেঘস্বরে
রাত্রি মেঘদূত পড়ে,
কাঁদিছে পেচকী,—
অরুণের চক্র পিছে
চিরসন্ধ্যা গুমরিছে
কেন বুঝেছ কি ?
—বুঝেছ কি কেন ?—
কত মরু কত রাতি
বলয়ে বলয় গাঁথি'
রচি যে শৃঙ্খলা

প্রিয়ার কণ্ঠের হার,
গ্রহ-সূর্য-তারকার
অপূর্ব মেখলা—
আজি সে আনন্দ মম
ছত্রভঙ্গ উল্কাসম
আঁকে অগ্নিরেখা ?
কে কাঁদে অন্তরে মোর,
অন্তরে কে কাঁদে মোর
অতিমাত্র একা ?

চন্দনে চম্পক-পুটে
জীবনের গন্ধ উঠে
এখনো চিতায় ;
এখনো মানস-তীরে
চক্রবাকী আঁকে শিরে
সিঁদুর সিঁথায় ।
মরণার্দ্র বালুস্তরে
চরণের চিহ্ন পড়ে
হংসমিথুনের.
কৃষ্ণাচতুর্দশী-স্নানে
চন্দ্রলেখা আজো টানে
পূর্ণিমার জের ।
হে বন্ধু, কহ গো মোরে
এ ঘন শ্রাবণ ঘোরে
কে কাঁদে আমার ?
নিভাতে বুকের জ্বালা

কে ছিঁড়ে মুক্তা মালা
কবরী-সম্ভার ?
শুনিয়া কাঁদন তার
বাঁধনের মালাকার
গ্রন্থি যায় ভুলে,
মহাসন্ন্যাসীর শিরে
চির-জটিলতা ছিঁড়ে
জটা পড়ে খুলে।

যত চুক্তি যত যুক্তি,
সব হ'তে দিতে মুক্তি
আসে বিশৃঙ্খল,
তাই কি আমার বুকে
হে বন্ধু, হাতুড়ি ঠুকে
ভাঙিছ শিকল ?

ঐ ত স্যাকরা পাখী
শুষ্ক শাখে ছন্দ রাখি'
করে ঠক্ ঠক্'
মুখেতে ইঁদুরছানা
মেলিল ধূসর ডানা
প্রসন্ন পেচক।

সুখময় কুম্ভকার
মাটি ছানি, কুম্ভ তার
পিটায়ে গড়ায়,
পাড়ার গোলাম মুচি
প্রেমের খোলাম কুচি
'দু'হাতে ছড়ায়।

ফুটেছে ব্যাঙের ছাতা,
কেন, আগে বলেছি তা'
প্রসন্ন পেচক,—
বলেছি স্যাকরা পাখী
শুকনো শাখায় থাকি'
করে ঠক্ ঠক্ ;—
বাগান, আকাশ-কোণে
আলো তার দিন গোনে,
হাসে অন্ধকার,
অর্থহীন কলরোলে
উত্তাল প্লাবন দোলে
এপার ওপার,—
শ্যেনপক্ষ সারি সারি
মুহূর্তেরা দেয় পাড়ি
সন্ত্রাস অন্তরে ;
ওগো বন্ধু, মাঝে তার
কেঁদে কেঁদে কে আমার
শ্রাবণ সন্তরে ?

এশিয়ার আশা

বসেছিন্‌ নিঃসঙ্গ—

সহসা আকাশে ঘনায়ে আসিল

বিপন্‌ল শকুন-সঙ্ঘ।

ক্ষণিকে ঢাকিল রাহন্‌ল ছায়ায়

উদয়-অস্তাচল,

তাদের পাখার শ্বাসে প্রশ্বাসে

প্রলয়ের পরিমল।

চক্ষে তাদের সন্‌তীক্ষ্ম কালো

রঞ্জন-আলো জন্‌লে,

ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে নরকঙ্কাল—

মরণের তনন্‌-তলে।

মহাদেউলের খিলান ফেটেছে—

রবি ডুবে তারি ফাঁকে,

সেই কাল-সাঁঝে শকুন-সঙ্ঘ

উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে।

মেরন্‌-অরোরার ঝর্ণাধারায়—

করিয়াছে উষাস্নান,

কুরন্‌বর্ত্তের আকাশ ভাসায়ে

অবিরাম অভিযান।

বারেক গৌরীশঙ্কর-চন্‌ড়ে,

চিরতুষারের বন্‌কে,

রেখে এল ক্ষণ-চরণচিহ্ন

বিশ্রাম-কৌতুকে।

বারেক শুনিল, বাঁকা চঞ্চুতে
ঘষি' চঞ্চল পাখা,—
দেওদারতলে সুরগঙ্গার
কুলু কুলু পিছুডাকা।
মানস-সরসে মরালমিথুন
দেখাল মৃণাল তুলে,
শ্যাম-উপকূলে নারিকেল-শ্রেণী
ডাক দিল দুলে দুলে।
পারসী-গোলাপে গাহে বুল্‌বুল্‌
কাস্পিয়ানের পারে,
দূর ককেশাস্‌ ইশারা জানায়—
পাইনে ও পপ্‌লারে।

অবহেলি' সবাকায়—
নির্নীড়মতি নির্ভরগতি
শকুন-সঙ্ঘ ধায়।
চক্ষে কেবল সুতীক্ষ্ম কালো
রঞ্জন আলো জ্বলে;
ন'ড়ে ন'ড়ে ওঠে নরকঙ্কাল—
তন্বীরও তনুতলে।
ওদের ডানার ঘন মন্থনে
যত বুদ্‌বুদ্‌ ফুটে,
বিশ্বের নীল নবনীত বিষ
বুঝি ভেসে ভেসে উঠে।
গণ্ডুষে ওরা পান করিল কি
পীত সাগরের বারি?

লোহিতসাগরে ভরিয়া লবে কি
রাঙা হৃদয়ের ঝারি ?
কৃষ্ণসাগর উড়াইয়া লয়ে—
কালবৈশাখী ঝড়ে
সাহারার বুক জুড়াবে কি ওরা
ঘন মেঘাড়ম্বরে ?
আকাশে আকাশে নিবাইয়ে বাতি
সঞ্চারি' কালো ছায়া
অতলান্তিকে ডুবাইবে কিরে
যত প্রশান্তী মায়া ?
সাত সাগরের তলে তলে যত
বেদনা গুমরি মরে—
সে ব্যথা কি আজ হাল্‌কা হয়েছে
ওদের পক্ষভরে ?
শত শৈলের পাঁজরে পাঁজরে
পুঞ্জিত ব্যথাভার—
সহসা আকাশে ছাড়া পেয়ে হাসে
মুক্তির হাহাকার ?

আমার মনের বাতায়ন খুলে
ব'সে আছি নিঃসঙ্গ—
গরুড় যে কাজ পারেনি তা আজ
পারিবে শকুন-সঙ্ঘ ?

ঘুমের সাথী

নয়নে ঘনালো শ্রাবণের ঘোর
বর্ষণ-ঘন রাতি,
তোমার মাঝারে খুঁজি আজ সখি
আমার ঘুমের সাথী।
অস্তাচলের এল সংবাদ,—
ভেঙে পড়ে সেথা চেতনার বাঁধ,
সুপ্তিসাগর প্লাবন-নেশায়
সহসা উঠেছে মাতি';
এই দুর্যোগে খুঁজে ফিরি সখি
আমার ঘুমের সাথী।

তুমি কেড়েছিলে নয়নের নিদ
মধুর মাধবী রাতে,
আষাঢ়াস্তের বিবশ দিবসও
জেগে কাটে তব সাথে।
সাধ ছিল মনে—ঘুমে দিয়ে ফাঁকি
অনিমিখ করি অতন্দ্র আঁখি
দুটি হৃদয়ের চির-জাগরণ
লিখিব নয়নপাতে।
তাই সখি মোরা জেগে বসেছিনু
বসন্তে বর্ষাতে।

আজও তুমি মম অনন্যতম
জাগরণ-সঙ্গিনী।

যদি কভু ভুলে পড়ি আমি ঢুলে
বাজে তব কিঙ্কিণী।
চমক ভাঙিয়া চাহি' ও-নয়ন
পান করি যেন নব রসায়ন,
অনাকুঞ্চিত নিশীথ শয়ন,
জেগে আছ বিজয়িনী।
তুমি যে গো মোর এ জীবন ভোর
জাগরণ-সঙ্গিনী।

আজি আসন্ন শ্রাবণ-প্লাবনে
জাগে প্রাণে প্রলোভন,
নিঃসাড় দেহে নিঃশেষ স্নেহে
বিবশ আলিঙ্গন।
মুদিয়া গিয়াছে আঁখি-পল্লব,
হৃদয়ে হৃদয়—নাহি অনুভব,
অধর-প্রান্তে বৃন্তচ্যুত
অচয়ন চুম্বন।
সংজ্ঞাবিহীন আসঙ্গে লীন
নিস্পৃহ তনুমন।

জানিব না সখি আছি কিনা আছি
আছ কিনা আছ পাশে,
বুঝিব না—যদি হয় বিনিময়
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে।
বাহুডোরে বাঁধা তনুর ভেলায়
উদাসীন প্রেম ভাসিবে হেলায়

সুপ্তিসাগর মিশেছে যেথায়
মুক্তির নীলাকাশে।
জানিবে না সখি আছ কিনা আছ,
আছি কিনা আছি পাশে।

তাই আসিয়াছি তোমার দুয়ারে
খুঁজিতে ঘুমের সাথী,
অনিদ চোখের ধ্রুবতারা ওগো
নিবাও তোমার ভাতি।
শ্রাবণ রজনী হ'ল যে নিঝুম
ঘিরে আসে যত ফিরে-যাওয়া ঘুম.
বাদল হাওয়ায় রাখা নাহি যায়
তোমার সন্ধ্যা বাতি।
ঘনায় নয়নে শাওনিয়া ঘোর,
হে মোর ঘুমের সাথী।

জাগরণ—আজ চেতনার লাজ
তন্দ্রার কশাঘাতে,
তার চেয়ে হোক প্রেমের পরখ
ঘুমের নিকষ-পাতে।
আমাদের সেই সোনার আঁচড়ে
একটি কোরকে যদি রং ধরে,
মেলে যদি দল একটি কমল
নীলজল-শয্যাতে,
সার্থক হবে আমাদের ঘুম
আজি এ শ্রাবণ রাতে।

বাইশে শ্রাবন, ১৩৪৮

মেঘ চাপা পূর্ণিমা,
আর সারি সারি মুখঢাকা রুদ্যমান আলোয়
শহরের নিষ্প্রদীপ রাত শ্রাবণ-সমাচ্ছন্ন।
আলো নিবল,
রাত কাটল,
পূর্ণিমা ছাড়ল,
কিন্তু প্রভাতের কপালে
আজ আর সূর্য উঠল না।
এমনি দিনেই,
এমনি শ্রাবণঘন গহন মোহে,—
কাননভূমি যখন কূজনহীন,
সকলের ঘরে যখন দুয়ার দেওয়া,—
একেলা পথিক গোপন তার চরণ ফেলে
নিশার মতো নীরবে পথ চলে।

শহরে তা অশোভন,
শহরে তা অসম্ভব।
পথিকের বাঁধাপথ আরও বেঁধে দেওয়া হয়েছে—
কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট হয়ে
পথিক যাবে।
তারই একটা মোড়ে—
সহস্র নিরুপায়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে ভিজছি।
দূরে হতে কানে আসছে—

বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি!
সহসা দেখা গেল—
মরণের কুসুমকেতন জয়রথ!
মনে হ'ল—
কি বিচিত্র শোভা তোমার—
কি বিচিত্র সাজ!

জয়ধ্বনির মধ্যে জোড়া জোড়া জোয়ান
আজ মৃত্যুমদে মাতাল হয়ে
টানছে সেই যান।
টলছে যত তাদের পা;
দুলছে তত রথের বিজয়কেতু!
হায় রে! যেন—
লটপট করে বাঘছাল,
যেন—
বৃষ রহি রহি গরজে!
বাঁধাপথে অগণ্য নগণ্যের জনতা;
তারই বুক দ্বিধা ক'রে
সিধা চলেছে মৃত্যুস্যন্দন
তার কলুটোলা স্ট্রীট, কলেজ স্ট্রীট,
কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট পার হয়ে।

সেই জয়যাত্রা-পথের বাঁকে
পলকের জন্য তুমি কাছে এলে বন্ধু!
পলকের তরে চোখে পড়ল তোমার মুখ!
মরণের অভিনন্দনে
সে মুখ কি অপরূপ হয়েছে বন্ধু!

মানুষের সকল পৌরুষ-প্রয়াস
বুকের পাটায় ঘ'ষে ঘ'ষে
উঠেছে যে ব্যর্থতার চন্দন,
তাতেই হল তোমার ললাট অভিলিপ্ত।
তাদের সকল প্রার্থনাকে পরিহাস ক'রে
ফুটে উঠেছে যে ফুল,—
তাতেই রচিত হ'ল তোমার মাল্য !

করজোড়ে, নতশিরে, প্রণাম ক'রে বললাম—
বিদায় ; বন্ধু ; বিদায় !
মরণের হাতের লীলাকমল তুমি,
চলেছ আজ, জনস্রোতের তরঙ্গে তরঙ্গে,
সদ্য ছেঁড়া সহস্রদল পদ্মের মতোই ভেসে
শোকের বারদরিয়ায়,
অগণিত নগণনীয়ের নাগালের বাইরে।
পরম অভিমানে তারা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে
তাদের নিষ্ফলা ফুল।
আমি ফুল দিইনি বন্ধু,
আমার পথে ফুলের দোকান পড়ে না।

আমি বলতে এসেছিলাম,—
হৃদয়বন্ধু, শোন গো বন্ধু মোর
কিন্তু তুমি তখন
আমার কথার বাইরে চ'লে গেছ।
তাই শুধু চোখের জল মুছে
চোরের মতো চুপি চুপি ঘরে ফিরছি।
ফেরার পথে, পরাজয়ের জয়োল্লাস
মৃদু হতে হতে আর শোনা যাচ্ছে না।

শুধু তার প্রতিধ্বনি উঠছে অন্তরে,—

আজি পিঞ্জর ভুলাবারে কিছু নাহি রে।

আর সাথে সাথে

রিক্‌শাওয়ালার ঠুনঠুনিতে সান্ত্বনা বাজছে—

কি বিচিত্র শোভা তোমার,

কি বিচিত্র সাজ !

শপথ ভঙ্গ

শোনো শোনো শোনো মনোরমা ;
নিগূঢ় অন্তর-ব্যথা
আজ তোমা, কহিব তা
করো যদি ক্ষমা।

তোমার যৌবন গেছে,
তবু আমি আছি বেঁচে
এ বড় বিস্ময় ;
আজি ওই তনুমন
কানুহীন বৃন্দাবন
শুধু স্মৃতিময়।

কপালে পড়েছে আঁকা
বিদায়-রথের চাকা
কুসুমকেতন,
রূপের ভিটার 'পরে
আঁখি মোর খুঁটে মরে
কী হারা রতন ?

মুখপানে তুলি' বাতি
মিছে খুঁজি অর্ধরাতি
সেই মুখখানি,
বাঁধা গান কেঁদে যায়,

ঠোঁটে এসে বেঁধে যায়
সোহাগের বাণী।

ফুঁ দিয়া নিবাই দীপ,
অন্ধকারে রচি টিপ
স্মৃতির কপালে,
অলক ঝালর তুলে'
শ্রবণ সাজাই দুলে
কন্ঠ ফুলমালে।

মুঠিম কটিতে আঁটি
পরাই খয়েরী শাটী,
পিঠে এলোকেশ,
অধরে চাঁদের ফালি,
কপোলে গোলাপ-ডালি
নয়নে আবেশ।

তনুর মুকুর ধরি,
মনের মাধুরী, মরি,
পলক হারায়,
থমকি চমক-মনে
দখিনের বাতায়নে
ফাগুন দাঁড়ায়।

কাঁদিয়া বাঁধিয়া বুকে
শুধাই গভীর দুখে
বলো বলো প্রিয়া,

কোথায় সঞ্চিলে ধন
অতুলন সে যৌবন
আমারে বঞ্চিয়া ?

ঠুনকো মণির মতো
টুকরো ছড়ানো যত
আমারি এ ঘরে,
জোড়াতাড়া দিয়ে তাই
তোমারে গড়িতে চাই,—
ভেঙে ভেঙে পড়ে।

শপথ করিয়াছিনু
ও-তব যৌবন বিনু
ধরিব না প্রাণ,
সুন্দর আনন্দপুর,
সহিব না, ও-তনুর
তিল অপমান।

অনন্য অর্চনাভারে
পাষাণ করিব তারে—
করিব অক্ষয়,
যতদিন আমি বাঁচি
তাহারি প্রসাদ যাচি
অর্জিব বিজয়।

সে দিন সহসা একি,
মাটির প্রতিমা দেখি
হয়নি পাষাণ ;

আমারি অঞ্জলি জলে
আমার প্রতিমা গলে,—
আসন্ন ভাসান !

হরিয়া আমার পূজা
যৌবনের দশভুজা
ডুব দিল জলে,
মলিন নির্মাল্য প্রায়
ও তনু পড়িয়া হায়
শূন্য বেদীতলে।

তখন অঝোরে কাঁদি'
লইনু আঁচলে বাঁধি'
পুষ্পের প্রসাদ.
ভাবি জীবনের ফের.
এই কিরে যৌবনের
শেষ আশীর্বাদ ?

অদিনে দুর্গম পথে
বাকী যাত্রা ভাঙা রথে,
কে আর সহায় ?
আমার মনের ভুল,
আমার পূজার ফুল
মোর মুখে চায়।

স্মৃতিগন্ধ-সুমধুর
সুপবিত্র ও-তনুর
করি' বহুমান
শপথ ভাঙিনু প্রিয়ে

বুক হ'তে তুলে নিয়ে
    শিরে দিনু স্থান।

মনোময়ী শোন প্রিয়তমা,
গাহিনু নির্লাজ ব্যথা
মুখ ফুটে কহিনু তা,—
    করিলে কি ক্ষমা?

বনপ্রস্থ

চলেছিনু শাল-জঙ্গল পরিদর্শনে ;—
দুর্গম পথ দুর্গমতর কালবৈশাখী বর্ষণে
থেকে থেকে দেয়া চমকায় ;
আর মাঝে মাঝে বাজ ধমকায়
কালো তুরঙ্গে অকাল সন্ধ্যা
পথ খুঁজে ফিরে শাল বনে,
যেথা গজারু গড়ের সংকটা বুড়ী
শত শংকার জাল বোনে,
সেই শালবনে, দূর শালবনে।

দুর্যোগঘন রাত্রিযাপন
নির্জন বনবাংলায় ;
নিম্নে পাহাড়ী নামহারা নদী
বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায়।
জল কেন হোথা ছল্‌কায় ?
বুঝি বাঘে-বাইসনে জল খায় ?
সুদূরে তরুণী গারোণীর ডাকে
পথহারা গাভী হামলায়।
আনন্দমঠী সন্ন্যাসীদল জাগিয়া
যেন ভাঙা মন্দির নির্মাণে গেল লাগিয়া,
উঠে কল কল কল হুম্‌কার,
বলো নির্জন বনবাংলায় আসে
ঘুম কার ?

হায়　　নিদ্রাবিহীন স্বপন আমার
টুটিবে কাল,
শ্যামবনশাখে রূঢ় বৈশাখী
হবে সকাল।
কালো মলাটের মোটা মোটা খাতা,
উলটিয়া যাবো রুলটানা পাতা,
হায়রে হায়,—
মিলাব যে সব সূক্ষ্ম হিসাব
লিখিত তায়।
যত গাছ আছে গোনা হ'ল কি না ?
লেখা হয়েছে ত সঠিক ঠিকানা ?
নক্সা হ'ল কি সীমানা এ'টে ?
ক' নম্বরের কোন শাল তরু
ক' ফুট লম্বা, মোটা ও বেঁটে !
বিনা পাশে কেউ ঘাস কেটে বনে
দিল কি ফাঁকি ?
ডাল ভেঙেছিল জরিমানা তার
এখনও বাকি !
হায় রে হায়,—
আজি রজনীর স্বপ্নশঙ্কামোহঘন এই
নির্জন বনবাংলায়
কল্য প্রভাত ভরিয়া উঠিবে
আমলায় আর মামলায়।

কোথা বাল্মীকি, ব্যাস, বশিষ্ঠ,
কোথা রামসীতা, গুহক মিতা !
বনে আসিলাম, সাথে সাথে এল

খাতা ও ফিতা।
কোথা কাম্যক হিড়িম্বা বক
কোথা দন্ডক শূর্পণখা!
কোথা মায়ামৃগ, ছিন্নপক্ষ পিতৃসখা?
স্ফটিক ফিরানো চলনদী-জলে
জপময় কোথা তপোবন!
হোম-ধূমাঙ্কী সাম-ওম্‌কৃত
জটিল বটের ছায়াসন?
ফুল-পল্লব-মঞ্জরী-ময়ী
আশ্রম সঞ্চারিণীরা কই?
যতনাপিহিত বল্কলা বালা?
হলা পিয়া সখি? কোথা বা কণ্ব?
অরণ্য হায় দারুভূত আজ
বনবিভাগের বিপণি পণ্য।

হায়রে হায়, --
বনবাসে এসে সই ক'রে চলি
বাঁধা খাতায়।
শুধু কাঠ, আর কিউবিক্ তার,
মেপে মরি বেধ, দৈর্ঘ্য প্রস্থ,
মনে মন নাই,—বনে বন নাই
ঘটিল না তাই বানপ্রস্থ!
পঞ্চাশোর্ধ্ব ক্ষুব্ধ জীবন
টেনে নিয়ে ফিরি গৃহাভিমুখে;
ঘরের দুঃখ এল যদি বনে,
বনে আসি তবে কিসের সুখে?

তবু,
কালি রজনীতে স্বপ্নশঙ্কাসম্মোহঘন

নির্জন বনবাংলায়

আমি হেরেছিনু কোন্ শিখরচারিণী

বাঁকে বাঁকে টাল্ সামলায় !

আর শুনেছিনু কোন্ বনঘরণীর

হারা গাভী দূরে হামলায় !

ঘোর ঘনাচ্ছন্ন ঝঞ্ঝাপন্ন

গহনারণ্য বাংলায় ।

নির্বাসন

মিলন-মলিন ধূলিতললীন
ক্লান্ত এ ভালবাসায়, বন্ধু,
বাঁচাও নিবিড় সজল মেদুর
নববিরহের আশায়, বন্ধু !
পাংশু গগনে পান্ডুর চাঁদ,
সব-সাধ মেটা একি অবসাদ ?
জ্যোৎস্নার বালুচরে দিগ্‌বাঁধ
ঢেকে দাও কালো মেঘে ;
গুরু গুরু গুরু কাঁপাইয়া বুক
বিদ্যুৎ-ব্যথা শিহরি' উঠুক,
শুষ্ক মুখের হাস্য ঝরুক্
ঝড়ের শংকা লেগে ।

নিদাঘ রজনী নীরবে দু'জনে
জাগি আজ,
তোমার চরণে জুড়ি' চারি কর
নির্বাসনের নবনির্দেশ
মাগি আজ ।
আজ মেঘদূত ফিরাও উজান পবনে,
অলকাক্লিষ্ট মিলনের ব্যথা
রামগিরি-গুহাভবনে ।
পথে যেতে যেতে যাক্ সে কুড়ায়ে
মিলন-মথিত ফুলের মালা,

শিথিল মৌর্বী ভ্রূধনুভ্রষ্ট
ব্যর্থ শরের মৌন জ্বালা ।

ছিন্ন করিয়া চুম্বনরত
গততৃষা যত অধরপুট,
সিক্ত করিয়া উদাসীন যত
অনিমেষ আঁখি পল্লবে,
ছিন্ন করিয়া ক্লান্ত শিথিল
প্রাণান্ত ভুজবন্ধন,
অকস্মাতের দম্‌কা হাওয়ায়
দুর্লভ করি' বল্লভে,—
নব মেঘদূত ভাসিয়া চলুক দেশে দেশে
রুদ্ধ-কক্ষ অলকা ত্যজিয়া
নিবিড়নীল নিরুদ্দেশে !

দুর্লভ করো বন্ধু আমায়
দুর্লভ করো হে,
অপরিচয়ের বিস্মৃতি-পার
করো অতিবল্লভারে আমার,
ঘননীল বাসে নবীন বিরহে
দুর্লভতর হে ।

সারারাত জ্বলে সন্ধ্যার দীপ,
ছায়া প'ড়ে আছে পায়,
ললাটে ক্লান্তি কালিমার টিকা
নির্বাণ করো, এ মিলন-শিখা,
দুটি হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে
নিঃশেষ করো তায় ।

বাসি মুখে হাসি পঙ্কজতার
পঙ্কজে বড় লাগে গুরুভার,
ফিরে যায় যদি পঙ্কেতে তার
গহিন তিমিরতলে,
সেথা সে আঁধারে রচিবে তপন
নূতন মৃণালে নূতন স্বপন, —
গোপন দুরাশা জানাই বন্ধু
চারি নয়নের জলে।

শেষ হল নিশা, আশিস মাগিয়া
প্রভাতী প্রণাম সারিয়াছে প্রিয়া,
ভোরের বাতাসে আঁচল সারিয়া
চলি' যায় শুভ'খন,
ক্ষম' গো বন্ধু এ মম প্রলাপ,
এবার মিলনে হানো অভিশাপ,
অপলাপ হ'তে বেঁচে যাক্ প্রেম
লভিয়া নির্বাসন।

বৈশাখের শাখে

মধ্যাহ্নের মরুবিহঙ্গম
নিঃশব্দ পাখায় করি' অতিক্রম
লোহিতসাগর আর সৈন্ধব-সঙ্গম,
ডানা মুড়ি' বসিল আমার বৈশাখের শাখে।
সেথা আজ—
শস্যহারা প্রান্তর ঊষর ;
সেথায় পারদ-রৌদ্রে আকাশ ধূসর।
বিদেশী বিহঙ্গ আনমনে
চঞ্চু ঘষে শাখে,
বিস্ময়-বিহ্বল বনে
পাতাটি না নড়ে
পাখীটি না ডাকে।
ম্লান চোখে শ্রান্তি সুনিবিড়,
পাখী কি বাঁধিবে হেথা নীড় ?
চাহে ঊর্ধ্বপানে—
পারদ-ধূসর সেথা আকাশ-দর্পণে
অনাগত শুক্লা রজনীর
আধ-চাঁদ-মুখছায়া ভাসে যেন মনে।
তরুতলে চায়,—
সেথা ছায়া পাতি' দাহ ঘুম যায়।
দক্ষিণে ও বামে—শস্যহারা মাঠ
নিতান্ত নহে ত অনুর্বরা কঙ্কর প্রখরা,

খড় কুটা শুষ্ক তৃণ সঞ্চয়ের নানা উঞ্ছে ভরা।
কলভাষা আভাসিয়া আসে
স্তব্ধ চঞ্চুপুটে,
শ্রান্ত আঁখি লুব্ধ হয়ে উঠে।
সংগোপনে বনলতা গুঞ্জন দুলায়—
অজানা বিহঙ্গ হেথা বাঁধিবে কুলায়।

অকস্মাৎ এল ডাক!
ছাড়িয়া বৈশাখ,
বারেক বিদ্যুৎকন্ঠে ছেদি' দিগন্তর,
মেলি কালবৈশাখীর পাখা,
ভাঙি' তার ক্ষণপূর্ব আশ্রয়ের শাখা
মহাবিহঙ্গম যায় উড়ে
উধাও সুদূরে।

উড়ে গেছে মরুবিহঙ্গম,—
কোন্ শ্যাম উপকূল,
সে কোন্ প্রশান্ত মহাসাগরসঙ্গম!
ভগ্নশাখ বৈশাখের ফাঁকে
নূতন আকাশ মেলে জ্যোৎস্নাপান্ডু আঁখি,
থেকে থেকে বহে মেঠো হাওয়া,
ডেকে ডেকে ওঠে বনপাখী।

মনোরমা

তোমারি মাঝে কবে যে আমি হারান্ু তোমারে !
বিজন তব গহন মনে হারান্ু মনোরমারে ।

নিবিড় নীল ঝঞ্ঝামেঘে
খ্ুঁজিয়া ফিরে কাতর আঁখি
কোথায় হায় মেলিয়া পাখা
মিলালো মোর সে নীল পাখী ?
ক্লান্তিহরা কন্ঠ তার
পিয়াসী কানে পশে না আর,
চমক-হানা ধমক মাঝে
দিগন্ত মেঘান্ধকার ।
গভীর অমা আঁধারতলে
হারায় স্নেহবটের ছায়া ;
র্ুদ্র মর্ু-মরীচি-ভালে
হারায় মরীচিকার মায়া, -
তেমনি আমি হারান্ু তোমারে,—
নিবিড় তব গহন মনে আমার মনোরমারে ।

ফিরিছ আজ ছদ্মবেশে—
ভস্ম মাখি' চাঁচর কেশে,
ল্ুলিত করি' ললিত তন্ু,
ত্রিবলি টানি' ললাটদেশে,
গের্ুয়া করি' চীনাংশ্ুক
র্ুদ্রাক্ষে ভরিয়া ব্ুক,

উদাস করি' মায়ার প্রাণ,
কঠিন করি' কোমল হিয়া !
ধেয়ানে তাই নয়ন বুজি'
তোমারি মাঝে তোমারে খুঁজি.
খেয়াল-খেলা খেলিতে বুঝি
গিয়েছে খোয়া কবির প্রিয়া ।
ক্ষমো এ লীলা নিঠুরতম
ফিরায়ে দাও প্রেয়সী মম—
তোমারি সংগোপন মনে
নির্বাসনে কাঁদিছে যে,
বরষা-ঘন বিরহ-ভরে
যে প্রিয়া তার কবিরে স্মরে.
বিভ্রষ্ট বলয় করে
কবরী নাহি বাঁধিছে যে,
ফোটা ও ঝরা কদম কেয়া
বাহিছে যার দুখের খেয়া.
পূরব বায়ে স্মৃতির দেয়া
গাহিছে যার ব্যথার গান ;
তোমারি নিতি-ছন্দতলে
যাহার হৃদি পদ্মদলে
গুমরে মধু স্মরিয়া তার
ভ্রমর-মুখে মাধবী পান.
ফিরায়ে দাও সে মনোরমা যে তব মনে নির্বাসিত
ডুবিয়া বিস্মরণী-নীরে মরণে আজো বরেনি সে-ত
জানি গো জানি কবির গীতি
ঢেউএর বুকে আকাশী চাঁদ.
জানি যে তার প্রিয়ার প্রীতি
স্রোতের মুখে বালির বাঁধ ।

যেতে যে হবে একা ও একা
কাহারো সাথী হব না কেহ,
যাবার আগে বারেক দেখা,—
জানি গো জানি ছলনা এহ।
তবু যে সেই দেখার তরে
ঝাপসা আঁখি ঝুরিয়া মরে
নিমেষ-হারা নিমেষ লাগি
তারকা হ'তে তারকা খুঁজি,
হাজারো বার দেখেছি যারে—
আবারও চাই দেখিতে তারে।
শেষের দেখা যদি বা থাকে
দেখার শেষ নাই গো বুঝি।

দাঁড়ানু তাই দেউলমূলে অকূল যেথা কল্লোলিছে।
পাঁজর-ভাঙা পাষাণ ঘাটে ভাঙিছে ঢেউ ঢেউ-এর পিছে,
সন্ন্যাসিনী তোমারে ঘেরি সন্ধ্যা উঠে পিঙ্গলিয়া,—
লুপ্তকারু অভ্রভেদী
দেউল,—সে কি শূন্য-বেদী?
দুয়ার খোলো প্রদীপ জ্বালো দেখিবে কবি কবির প্রিয়া—
তোমারি মাঝে তোমারে, আর
হারানো মনোরমারে তার।

সময়বিৎ

গান যদি তার না থামাতে পারে
সমে অর্থাৎ সময়ে
বুঝিবে কবির মগজ ভর্তি
গব্যে ওরফে গোময়ে।

* * *

আগে চুরি করে জেল খাটে পরে
নির্বোধ চোর যারা.
আগে জেল খাটে পরে চুরি করে—
সেয়ানা স্বদেশী তারা।
যে চুরিতে ভাই জেলখাটা নাই
না আগে না পশ্চাৎ ;
নিরীহ আমরা বাণীর সেবক
তাতেই পাকাই হাত।

ছড়া

থুথুরে থুথুরে   থুথুরে থুড়ি
শাক-ওয়ালী   তিনকেলে বুড়ী।
কমলা দীঘির   জংলা পাড়
হুমড়ে টানছে   কলমির ঝাড়।

শুশুনি কলমি   ল' ল' করে
বুড়ীর মাথায়   ঝুড়ির পরে।
ঝুড়ির নীচেয়   কাঁপছে ঘাড় —
শীতের হাওয়ায়   কচুর ঝাড়।

পদ্মের পত্রে   ছল ছল জল
দলমল দলমল   কলমির দল।
চলছে তিনকাল পা পা হাঁটি
বোঝার উপরি   শাকের আঁটি।

কাঁপছে কণ্ঠ   উঠছে ডাক—
নাও মা শুশুনি   কলমির শাক।
শুশুনি কলমি   ল' ল' করে
নামিয়ে নাও মা ঘরে ঘরে।

হাঁকছে তিনকাল শুনছে কে?
কানছে এককাল মুখ ঢেকে।
চলছে চলছে গুটি গুটি
নাও মা নাও মা দাও মা ছুটি॥

জন্মদিন

মেঘের আড়ালে আষাঢ় দিবস চুপি চুপি চ'লে যায়,
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
আবাহন-হীন এ আষাঢ় দিন বারে বারে গেছে চলি'
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি'।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কী চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারাজীবনের মুখ।

আজিকার কালো, রবি শশাঙ্কে হয়নি কলঙ্কিত,
কাল সাগরের কৃষ্ণকমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত।
ঢল ঢল তার নির্মল শোভা সনির্বন্ধে ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সজল গগন ঢাকে।
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্মর কোষে তপন তারকা—তারি মধুপানে লীন।
চির কলঙ্কী ওরে কবি তোর কি সৌভাগ্য বল্—
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল।

পেরেছিস্ কিরে চিন্‌তে ?
মরণকমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে।
চেয়ে থাক্ চেয়ে থাক্,
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক।

পরাভব

এ যে মরণের ভ্রূকুটি-ভয়াল
মুখোশ আঁটিয়া মুখে,
চির জীবনের বন্ধু আমার
দাঁড়াইলে পথ রুখে।
সতিমির সংকীর্ণ সরণি,
বলহীন আমি একা,—
ভীম ভৈরব বীরপুঙ্গব,
তাই কি মিলিল দেখা ?
আতঙ্কে আমি কাল-ঘাম ঘামি'
টলিয়া পড়িব পায়ে,
তখন তোমার পরশ-অমৃত
লাগিবে সে মৃত কায়ে।
জীবন থাকিতে বন্ধুর সাথে
দেখা বুঝি হ'তে নাই,
চির বুভুক্ষু তৃষিত জনেরও
খাবি খাওয়া চাই-ই চাই !

তাই বুঝি হেরি আজ,
আপাদমস্তে, নমোনমস্তে,
যুদ্ধং দেহি সাজ !
কোথায় লুকালে ফোটা মালতীর
পরিমল মনোহর ?
কোথায় শুকালে ঝরা বকুলের
অফুরান নির্ঝর ?

নবনীল নভে শ্যামরূপাভাস
কুহু-কণ্ঠের ধ্বনি ?
শিশিরে শিশিরে ঝরানো ছড়ানো
অশ্রু-পরশমণি ?
সকলি ঘুচায়ে দাঁড়ালে আমার
ভুবন আঁধার করি',
বন্ধুর পাশে বন্ধু কি আসে
বিভীষিকা-রূপ ধরি' ?
দীর্ঘ দুখের পসরা মাথায়
জরাভারে দেহ কাঁপে.
হে নওজোয়ান এখন এসেছ
শক্তির পরিমাপে ।
পুরুষ হইয়া হেন কাপুরুষে
বন্দি বন্ধু বলি'
সে দুঃখে এই ভিজে ভস্মও
উঠিতে চাহে যে জ্বলি' ।

জানি তা হবার নয়,- -
এবারেও সেই মুখোশধারীর
মায়াযুদ্ধেরই জয় ।

তবু যে যুঝেছি, আজও যুঝিতেছি
সেই মোর গৌরব ;
মানুষের মত মানুষেরই হয়
বার বার পরাভব ।

আসছে জন্মে

রোয়াকবাঁধে খোলা বারান্দায়
শীতের সূর্য গড়ায়ে যায়।

পড়ন্ত রোদে পথের প্রান্তে
অশথের পাতা কাঁপছে,
কি শীত গ্রীষ্ম কেঁপেই আসছে তারা ;
বলি-বন্ধুর অশথের গুঁড়ি
একঠাঁয়ে খাড়া ভাবছে,
কি শীত গ্রীষ্ম সে শুধু ভেবেই সারা
একশ বছরে উদ্ভট যত ভাবনা।
পড়ন্ত রোদে পিঠ পেতে শুয়ে
দুধোলো গাভীটি জাওরায়,
তন্দ্রিত চোখে ঠাওরায়-
সারা গোজন্মে কোথায় কিসের ভাবনা ?
চোয়ালে জাবর, গোয়ালে ফিরেই
কোঁয়ালে বাছুর ও জাবনা।

একই ঠাঁয়ে খাড়া একশ বছর দাঁড়ায়ে
অচল অশথগুঁড়ি
আঁধারের তলে অন্ধের প্রায়
শিকড়ে শিকড়ে রস হাতড়ায়,
করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি।
একই ঠাঁয়ে খাড়া চিরনিদ্‌হারা

ঊর্ধ্বে আকাশ ফুঁড়ি'
পাতায় পাতায় আলো আঁকড়ায়
শাখায় শাখায় পাখা ঝাপ্টায়,
ঝড়ে ঝড়ে মোড়ামুড়ি।
চিরচঞ্চল পায়ে-শৃঙ্খল
অচল অশথগুঁড়ি।

সদ্গোপেদের দুধোলো গাইটি ভালো,
নধর চিকন কালো
অচল নয় সে চ'রে খেতে পারে
লেজের বাড়িতে ডাঁশ মশা মারে,
ভুলেও ভাবে না দুষ্প্রাপ্যের ভাবনা ঃ
অতীব সরল হিসাব তাহার
দুধের বদলে জাবনা।
উপরন্তু সে জাবর কাটে
পড়ন্ত রোদে ভরা পেট পেতে
ঢুলু ঢুলু আঁখি শীতের মাঠে।
গলার দড়াটা মাঝে মাঝে খোলা পায়,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ-কায়।

এবারের মতো মনিষ্যি হ'য়ে
পুণ্যের ঘরে শূন্য ;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ।
সুতরাং সব চেপেই যাই,
রোঢ়াবাঁধে এসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সর্বযামী,

দেখা পেলে তাবে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কী হব আমি ?
জানায়ে দিতাম আমারও দাবি
পথের প্রান্তে অশথগাছ, না।
সদ্‌গোপেদেব দুধোলো গাভী ?
আমাব মতন মনিষ্যিদেব
খোলা আছে দুটি ভবিষ্যৎ,
হয় গোজন্ম নয় অশথ !

সমাজ-ছাড়াটির মাঝে-মাঝে কোনো বাঁধ,
তারি আনন্দে ঘন-রোমাঞ্চ: হায়।

এ-কালের সত্যের সন্নিষ্ঠ হবে
দুর্নীতি ঘরে শূন্য;
সব কথা যদি খুলে বলি তবে
শত্রু হাসিবে
বন্ধুরা হবে ক্ষুণ্ণ; —
সুতরাং সব চেপেই যাই।
কোথাকারে বসে বন্ধুবরের খবর নাই।
সে যে ছিল মোর সহযাত্রী,
দেখা পেলে তারে জিজ্ঞাসিতাম
আসছে জন্মে কি হব আমি?
জানাতে দিতাম অসমাপ্ত বাণী —
পথের প্রান্তে অশ্বত্থ-গাছ, না
সংগোপনের পুঁইবেলো লতা!

আমার মতন সন্নিষ্ঠদের
কোনো আছে দুটি-চরিত্র, —
হয় লোকহিত নয় স্বার্থ।

মাঘ ১০

কবির শেষ কবিতা 'আসছে জন্মে'র পরিমার্জিত খসড়ার শেষ অংশ

স্মৃতিকথা

যতীন আমার সমবয়স্ক, অন্তরঙ্গ ও অভেদাত্মা বাল্যবন্ধু।

এত কাল পরে সেদিন তার ইচ্ছা হয়েছে নিজের জন্মদিন নিয়ে একটা কবিতা লেখে। কিন্তু জন্মদিনটা মনে নেই, কারণ সেটার প্রয়োজন জীবনে হয়নি। আমায় জিজ্ঞাসা করলে, 'ভাই, তোর ত সবই মনে থাকে, আমার জন্ম-তারিখটা বলে দে।' আমি হেসে বললাম, 'মনে হচ্ছে তোর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল আষাঢ়স্য ত্রয়োদশ দিবসে।' কোষ্ঠী খুলে দেখা গেল সে জায়গাটা ছিন্ন, কীটদষ্ট। প্রায় ৮৪ বৎসরের পুরানো কাগজ, দোষ দেওয়া যায় না যাই হোক, আমার কথায় বিশ্বাস ক'রেই যতীন 'জন্মদিন' শীর্ষক ক ব লিখে এনে আমায় শোনাল :

মেঘের আড়ালে তেরই আষাঢ় চুপি চুপি চ'লে যায়
অপরিচিতের মতন এবারও বিদায় দিবি কি তায় ?
বার বার বার তেরই আষাঢ় এসেছে গিয়েছে চলি,
নয়নধারায় করিয়া সিক্ত কোন কথাটি না বলি।
এবার সাধিয়া শুধাও তাহারে কি চাহে সে বলিবারে,
জীবনে যাহারে করনি স্মরণ, বরণ করহ তারে।
তারি বক্ষের সজল শ্বাসে ভরি' লহ তব বুক,
এই দিনটির দর্পণে দেখ সারা জীবনের মুখ।
আজিকার কালো, রবি-শশাঙ্কে হয়নি কলংকিত
কাল-সাগরের কৃষ্ণ কমল পূর্ণ প্রস্ফুটিত !
ঢল ঢল তার নির্ম্মম শোভা সনির্বন্ধ ডাকে,
তারি গন্ধের মেদুর ছন্দে সকল গগন ঢাকে,
তারি বুকে নেমে আলোকের পাখা হ'ল গুঞ্জনহীন,
মর্ম্মের কোষে তপন তারকা তারি মধুপানে লীন।

শ্রীবিপ্রতীপ গুপ্ত ছদ্মনামে লিখিত কবির এই আত্মস্মৃতি ১৩৫৬ সালে মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

চির কলংকী ওরে কবি, তোর কী সৌভাগ্য বল্
এই দিনটির মৃণালে ফুটিল হেন সহস্রদল ।।
পেরেছিস্ কি রে চিনতে ?
মরণ কমল ফুটে আছে ওই জন্মদিনের বৃন্তে
চেয়ে থাক চেয়ে থাক
বন্দনাহীন অর্ঘ্যবিহীন নিশ্চল নির্বাক ।

এই কুড়ি ছত্রের কবিতাটি ১৩ই আষাঢ়ে আরম্ভ কোরে ৫ই আষাঢ় শেষ হয়েছে আর জন্মদিন উপলক্ষে মৃত্যুকে টেনে এনে হাজির করেছে। যতীনের এই রকমই হয়। কবিতা শুনে বাহবা দিলাম কারণ বুঝলাম বন্ধু তাই চায়।

বাল্যে বা কৈশোরে যতীনের কবিতা-রোগ দেখিনি। ৮ বছর বয়সে সেই যে ম্যালেরিয়ায় ধরল, স্বরূপে বা বহুরূপী হয়ে আজ পর্যন্ত তাকে আর রেহাই দেয়নি। নদীয়া জেলার হরিপুর গ্রাম যার পিতৃভূমি আর বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া যার মাতৃভূমি এবং জন্মভূমি, সে যে এখনও বেঁচে আছে এই আশ্চর্য। তার পাঁচ-ছয় ভাই-বোন কেউ শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি।

১২ বছর বয়সে গ্রামের স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে সে কলকাতায় গেল কাকার বাসায় থেকে পড়াশুনা করতে। বছর দেড়েক স্কুলে অধ্যয়ন করার পর হ'ল তার বিউবনিক প্লেগ। আমাদের পল্লীবাসীর দেহ তখনকার দিনে ম্যালেরিয়ার কাছে বন্ধক দেওয়া সহরের প্লেগ আমল পেল না, যতীন সেরে উঠল। মাস ছয়েক পরে আবার তাকে ধরল তখনকার বাতশ্লৈষ্মিক বিকার এখনকার টাইফয়েড। নাড়ী ছাড়ি ছেড়ে গেল কিন্তু প্রাণ রইল। আমরা বললাম 'যতীন, আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই পাশের গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে, সেইখানে পড়ি চল্! তাই হ'ল।

মাস কয়েক সেখানকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ার পর যতীন আরও শীর্ণ হ'য়ে পড়ল। তার পিতা তখন বালেশ্বরে সামান্য চাকরি করেন। তিনি তাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি কোরে দিলেন। জলহাওয়ার গুণে যতীন কয়েক মাসে মোটা হ'যে উঠল, কিন্তু বাপের গেল চাকরি। কলকাতায় ফিরে এসে ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৯০৩ খৃঃএ এনট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তরণ। বেনেটোলার মেসে যখন একসঙ্গে থাকতাম, তখন এক এক দিন বলতাম—যতীন, তোর জ্বর এলে লেপ চাপা দিয়ে স্কুলে

যাই, ফিরে এসে কোন দিন দেখব মরে প'রে আছিস্। সে বিস্কুট খায়, বীজগণিত কষে, আর হাসে।

সেদিনের জেনারাল এ্যাসেম্ব্রি (এখনকার স্কটিস্ চার্চ) কলেজ থেকে ১৮ বছর বয়সে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে কোন্ লাইনে যাওয়া যায় এই নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছে তখন এক বন্ধু এসে বললেন, 'শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হোস্টেলে থাকতে পেলে জীবন ধন্য হ'য়ে যাবে। অভিভাবকের কোন বালাই নেই, তার উপর হোস্টেল-প্রাঙ্গণের পুকুরে যে পদ্ম ফুটে থাকে তা তুলনাহীন।' পদ্মের লোভেই যতীন অভিভাবকদের মত করিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হ'তে গেল। এই ব্যাপারে তার কবিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ আমাদের মনে প্রথম জাগে। ··কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে কি বস্তু সে বিষয়ে যতীন বা তার অভিভাবকদের কোনই ধারণা ছিল না। পদ্ম-পুকুরের সন্নিকটে বসেই প্রাবেশিক পরীক্ষা করলেন সেখানকার ডাক্তার। বুকের মাপ, দেহের ওজন, সবই কম হ'ল। তখন ডাক্তার বাবু আর একটা পরীক্ষা করলেন। সেই তৃতীয় প্রহরের নিদাঘ রৌদ্রে দূরের একটা অশ্বত্থ গাছ দেখিয়ে বললেন—ঐ পর্যন্ত জোরে ছুটে গিয়েই ছুটে ফিরে এস। হাঁপিয়ে গেলেও যতীন সেটা ভালোই পারল। কিন্তু সেই অবস্থায় তাকে যখন 'ষ্টেট্স্ম্যান' কাগজ উল্টো ক'রে পড়তে দেওয়া হ'ল তখন আর পাশ-ফেল বোঝা গেল না। ডাক্তার বললেন তুমি বি-এ পড়গে যাও। সে যখন বারান্দা ছেড়ে নেমে যাচ্ছে, তখন ডাক্তার বাবু করুণাপরবশ হয়ে পাশ করিয়ে দিলেন ; অর্থাৎ বুকের মাপ দেহের ওজন ইত্যাদি বাড়িয়ে লিখে দিলেন। আমরা ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্য কোমর বাঁধলাল।

লেখাপড়া যা হয় হ'তে লাগল, কিন্তু মুস্কিলে পড়া গেল ওয়ার্কশপ নিয়ে। প্রথম বৎসর ছুতারখানার কাজ। প্রথমেই প্রত্যেককে রেলের স্লিপারের মত একটা কাঠ দিয়ে হাতকরাতের সাহায্যে সেটাকে ফালা-ফালা কোরে চিরতে বলা হ'ল। সেই সামান্য কাজটুকু সুসম্পন্ন করার পর আসল কাজ শেখানো হবে। দু'-তিন দিনের মধ্যে দু'হাতে ফোস্কা প'ড়ে, গ'লে, ঘা হ য়ে গেল, কিন্তু কাঠ বিদীর্ণ হ'ল না। দু'চার জন তার পরই সরে পড়লেন অভিভাবকদের বহু টাকা নষ্ট ক'রে। মনে হচ্ছে, বর্তমানে এক জন রাজ্যমন্ত্রী তাঁদেরই অন্যতম। ব্যাড্মিন্টন খেলার মাঠে তিনি বাঁ হাতের কর্কে কিছুতেই ডান হাতের ব্যাট্ ঠেকাতে পারতেন না : সেও বোধ হয়

কলেজ ছাড়বার আর একটা কারণ। ভালোই করেছিলেন; আজ তিনি ত্যাগধন্য ও দেশমান্য।

যাই হোক্, আমরা গরীবের ছেলে, প্রাণপণে কাজ ও পড়া চালিয়ে যেতে লাগলাম। যতীনের মাঝে-মাঝে জ্বর হয়, কিন্তু ডাক্তারখানায় কুইনাইনের দাম লাগে না এবং কুইনাইন মিক্সচার খেয়েও যতীনের আর মুখ ধোবার বিশেষ দরকার হয় না। ডাক্তার পথ্য পাঠান—পাঁউরুটি আর মাংসের ঝোল। সে ডাক্তারটির বিশ্বাস ছিল পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই বাঙ্গালীর ছেলেদের অত ম্যালেরিয়া হয়, বিশেষত শিবপুর কলেজের ঐ খাটুনির পর, মাত্র ডাল-ভাত খেয়ে। যারা সুস্থ তাদের কোন সাহায্য তিনি করতে পারতেন না, কিন্তু রোগী হ'লে তিনি ঐ প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করতেন।

বন্ধু মিহিরলালের সঙ্গে যতীনের তর্ক বেধেছে। মিহির বলে, রবীন্দ্রনাথের মত কবি বাংলায় জন্মায়নি। যতীন উত্তপ্ত হ'য়ে জানায়, নবীন সেনের 'কুরুক্ষেত্র' যে প'ড়েছে সে ও-কথা বলবে না। কিছু দিন পূর্বে আমরা 'কুরুক্ষেত্র' পড়েছিলাম, মাইকেলের 'সীতা ও সরমা' অংশ, হেমচন্দ্রের 'অশোক তরু' প্রভৃতি দশ-বিশটা কবিতাও পড়া ছিল। বাল্যকালে পিসিমার কাশীরাম দাসের মহাভারতখানি যতীন দেখিয়ে-লুকিয়ে কয়েক বার শেষ করেছিল। গ্রামের মুচিপাড়া ও কুলোপাড়ায় বারোয়ারি পূজায় কবির গান ও তর্জার লড়াই আমরা শুনেছি। কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আমরা তখনও পড়িনি,গান দু'-দশটা শুনেছি। মিহির মৃদু হেসে বলল—নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথে কি তফাত সেটা বোঝাবার জন্য রবি বাবুর কাব্যগ্রন্থাবলী তোমাদের দেব, আগামী বর্ষাবকাশে প'ড়ে দেখ, তার পরে তর্ক কোরো। মিহির-প্রদত্ত, আড়ে-দীঘে সমান, একখানি প্রকাণ্ড রবীন্দ্রকাব্য গ্রন্থাবলী নিয়ে ছুটির সময় হরিপুরে এলাম। পড়ে দেখে আমরা তো অবাক! হায় নবীন সেন! এই বিদ্যে নিয়ে মিহিরের সঙ্গে তর্ক করা হচ্ছিল। বয়স তখন উনিশ উত্তীর্ণপ্রায়। যতীন বললে ধরিত্রী দ্বিধা হও।

যাক্, ছুতারশাল-কামারশাল-কণ্টকিত বিদ্যার পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে পাশ কোরে যতীন ট্রেনিং নিতে ঢাকায় গেল। সেখান থেকে ফিরে পিতৃভূমি নদীয়ার জেলা-বোর্ডের চাকরি জুটল ১৯১৩ খৃঃঅ। এই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। তখনকার জেলা-বোর্ডের প্রবীণ ও প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী কৃষ্ণনগরেই। প্রথম বয়সে কিছু দিন P. W. D. তে

চাকরি ক'রে তিনি অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বংশেরও ধনখ্যাতি ছিল। তার উপর তাঁর পরিবারবর্গ বলতে তিনি ও তাঁর পরিবার। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন তেমন নয়। তাঁরই স্নেহচ্ছায়ায় ও সহকারী হিসাবে চাকরি আরম্ভ ক'রে যতীনের আর উপরি-পাওনা নেবার অবকাশ বা অভ্যাস হ'ল না। আমি বলেছিলাম, 'শুকনো মাহিনায় তোমার চলবে না! সংযম থাকলে মদ খেলেও মাতাল হয় না, চুরি করলেও চোর হয় না: আর শতকরা হিসাবে ঠিকাদারদের লাভের অংশমাত্র গ্রহণ করলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সেটা চুরি নয়।' যতীনের সাহসে কুলিয়ে উঠল না। ক্রমে দেখলাম, এ বিষয়ে তার একটা অহমিকাও জন্মে গেল।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ারের একটা প্রধান দোষ ছিল, তিনি সে সময় চোখে বিশেষ কিছু দেখতে পেতেন না। জেলা-বোর্ডের চাকরিতেই একটা এ্যাকসিডেন্ট হ'য়ে একটি চোখ পূর্বেই নষ্ট হ'য়ে যায় এবং বাকিটিতে বেশ ঝাপ্‌সা দেখতেন। অতিশয় অমায়িক, সদাশয় পুরুষ: বোর্ডের সদস্যদের বিশেষ প্রিয়। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট্ অর্থাৎ বোর্ডের চেয়ারম্যান্ বাঙ্গালী এবং তাঁর কৈশোরের বন্ধু। কার্যে অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সুতরাং সেই ঝাপসা-দেখা একটি চোখেই জেলা-বোর্ডের কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হচ্ছিল। কার্যপরিদর্শনে গিয়ে পল্লীপথে সাদা গরুকে ভদ্রমহিলা মনে কোরে তিনি পথের এক পাশে দাঁড়াতেন, আবার ভদ্রমহিলাকে গরু মনে কোরে লাঠি উঁচিয়ে পূর্বের ভ্রম সংশোধন ক'রে নিতেন, এমন রটনাও ওভারশিয়াররা করত। কিন্তু সে সব অবিশ্বাস্য কথা কোন দিন বোর্ডের মিটিঙে ওঠেনি।

এমন সময় এক জন বঙ্গবিশ্রুত হৃষ্টপ্রকৃতি আধখ্যাপা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন সম্ভাবনায় ইঞ্জিনিয়ার বিচলিত হ'য়ে উঠলেন। ঐ সাহেবের এমন বদনাম ছিল যে, পূর্বে তিনি আর এক জন ইঞ্জিনিয়ারকে প্রহার দিয়েছিলেন। তিনি সত্য সত্যই এলেন এবং প্রথমেই বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যানকে ছোট এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন—'এই অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার কত দিন হ'তে বোর্ডকে প্রতারিত করছে এবং বোর্ড তার নিকট কি পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দাবী করতে পারে, আমায় জানানো হউক।' বিষয়টি বোর্ডের অধিবেশনে পেশ করতে হ'ল এবং সদস্যদের নির্বন্ধাতিশয়ে সাহেব-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ারকে এক বৎসরের ছুটি দিলেন, আর

যতীনের উপর ভার প'ড়ল অস্থায়ী ভাবে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার। সাহেবের ইচ্ছা, ইতিমধ্যে এক জন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ার খুঁজে নেবেন।

এ-সাহেব যে কোন সময় দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতে পারে; সুতরাং যতীনকে প্রাণপণে চাকরি করতে হ'ল। সাহেব খুশি হলেন এবং ইঞ্জিনিয়ার খোঁজা বন্ধ করলেন। কিন্তু নদীয়া জেলার আবহাওয়ায় অতিপরিশ্রমে যতীনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'ল। সেটা হ'তে অবশ্য বেশ কিছু দিন সময় লেগেছিল। তার মধ্যে বৃদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার ছুটি পান, আর যতীন কাজ চালিয়ে যায়। এই অবস্থা। যতীনের চাকরি যখন পাকা হওয়ার কোন বাধা দেখা যাচ্ছে না, তখন ঘুঁটি কেঁচে গেল। সাহেব বদলি হ'য়ে গিয়েছেন, অন্ধ ইঞ্জিনিয়ার অস্ত্রোপচারের ফলে আবার ঝাপ্সা দেখছেন, ম্যাজিস্ট্রেট্-চেয়ারম্যান পরিবর্তিত হওয়ায় বেসরকারী চেয়ারম্যান পেয়ে বোর্ড পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন করায়ত্ত করেছে। সুযোগ বুঝে ভূতপূর্ব ইঞ্জিনিয়ার মাত্র ছয় মাসের জন্য কাজে যোগ দেবার প্রার্থনা জানিয়ে দরখাস্ত করলেন। কিন্তু তার একটা অন্তরায় উপস্থিত হ'ল। বোর্ডের কাগজপত্রে দেখা গেল, তাঁর বয়ঃক্রম তখন চাকরির সীমারেখা অতিক্রম করেছে, অর্থাৎ আইনানুসারে তাঁর আর চাকরি করা চলে না। তিনি আর একটা সরকারী নথি থেকে নজীর দেখালেন, বয়স এখনও সীমারেখার মধ্যেই আছে। দু'টি বয়সের মধ্যে মাত্র ৫ বৎসর তফাত। আসলে, ছাপার দোষে ইংরাজি আট এক স্থানে তিন হ'য়েছে; আর আটটাই যে ঠিক সে বিষয়ে তাঁর বা অপর কারও কোন সন্দেহ ছিল না। যাই হোক্, দু'টি বয়সের মধ্যে কোনটি ঠিক, তাঁকে এফিডেবিট করতে বলা হল। এফিডেবিট না ক'রে তাঁর বয়স কত, সে বিষয় সিদ্ধান্ত করবার ভার তিনি বোর্ডের উপর দিলেন। বোর্ডের অধিবেশনে ভোটে তাঁর বয়স ধার্য করা হ'ল এবং তাঁকে ৬ মাসের জন্য কাজে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হ'ল। যতীন পেল ঐ ছ'মাসের ছুটি।

চাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। ভগ্নস্বাস্থ্য যতীন নেয় ছুটি, আর ঝাপ্সা দৃষ্টি ইঞ্জিনিয়ার পান extension। স্বগ্রামে ব'সে যতীন চরকা চালায় খদ্দর বোনায়, কিন্তু জেল খাটে না। একটা দেশলাইএর হাতকল কিনে গ্রামস্থ বালক-শ্রমিকের সাহায্য নিয়ে ভাবে এই ছুই কুটিরশিল্পের দৌলতে গ্রামের উপকার এবং তারও জীবিকার সংস্থান হবে। স্বাস্থ্যের যে প্রকার অবস্থা তাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বোর্ডের চাকরি করবার আশা বা ইচ্ছা তার

আর নেই। খদ্দরে আর সেদিনকার দেশী দেশলাইএ যে পেট ভরবে না, সে কথা সবাই বুঝছে, যতীন বুঝছে না। এমন সময়, প্রায় তিন বৎসর পরে তার জুটে গেল কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের এষ্টেটে ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি। অত্যন্ত অনিচ্ছায়, আত্মীয় স্বজনের আগ্রহে দেশলাই ফেলে এবং চরকা নিয়ে যতীন যোগ দিলো সেই কাজে ১৯২৩ সালে, যখন তার বয়স ৩৬ বৎসর। সেই বৎসর তার প্রথম কবিতা-পুস্তক 'মরীচিকা' প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি কৃষ্ণনগরে চাকরি করবার সময় ও তৎপূর্বে রচিত। স্বাস্থ্যভঙ্গের তিন বৎসর যতীন কোন কবিতা লেখেনি।

কাশিমবাজারের চাকরিতে যোগ দিয়েই যতীনের ঘাড়ে আবার সাহেবই চাপল। ঋণগ্রস্ত মহারাজা স্থির করেছেন নিজের একমাত্র প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পরিবর্তে এক দুঁদে ও অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান সাহেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করবেন। তাই হ'ল এবং সাহেব এলেন। কৃষ্ণনগরের সাহেবটির মত এঁরও সুনাম আছে, প্রয়োজন হ'লে চাবুক চালাতে দ্বিধা করেন না। কাশিমবাজারের বৈষ্ণবরাজ্যে সাহেবি আমল প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কর্মচারীদের প্রায় সকলেরই চাকরি গেল, যতীন নূতন ব'লেই বোধ হয় চাকরিটা থাকল।

মহারাজ যে সাহেবটিকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন, তিনি অপ্রতিহত প্রভাবে ছয় বৎসর রাজদণ্ড চালনা করেছিলেন। সাহেব প্রথমেই পুরাতন কর্মচারী ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন ক'রে নূতন নূতন লোক নিযুক্ত করতে লাগলেন। জমিদারী সেরেস্তার পুরোনো পদবী বাতিল হ'য়ে এ্যাকাউন্টেন্ট, সুপারিনটেন্ডেন্ট, অডিটার ইত্যাদি নূতন পদে নিত্য নব লোকের আগমন সুরু হ'ল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই গবর্ণমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ কর্মচারী। বেতন পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী, যোগ্যতাও বোধ হয় বেশী। প্রত্যহ নূতন নূতন বৃদ্ধের আগমন দেখে মহারাজারই এক বৃদ্ধ সুরসিক কর্মচারী এক দিন বললেন, এমন ঘটনা এ রাজ্যে আর একবার ঘটেছিল। সকলে বিস্মিত হ'য়ে তাঁকে ঘিরে বসলে তিনি গল্প সুরু করলেন :

"তখনকার রাজা বর্তমান মহারাজার ন্যায় এমন খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন না, মাঝে-মাঝে একটু-আধটু শাক্তপথেও চলতেন! পূজার সময় রাজবাটীর সুপ্রশস্ত নাটমন্দিরে যাত্রাগান চলছে; আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একমনে

শুনছে! রাজা চলেছেন সদর থেকে অন্দরমহলে। মাঝে নাটমন্দির পার হবার সময় দেখলেন, যাত্রার আসরে কে এক জন লম্বিতশ্মশ্রু বৃদ্ধ চমৎকার বক্তৃতা করছে। রাজা পার্শ্বস্থ পরিষদকে জিজ্ঞাসা করলেন- ও কোন্ হ্যায়?' পরিষদ করযোড়ে নিবেদন করল—'হুজুর, ও নারদ মুনি হ্যায়।' রাজা বললেন—'ও ত বহুৎ আচ্ছা বোলতা হায়, অউর মুনি হ্যায়?' চারি দিকে সাড়া প'ড়ে গেল, যাত্রার অধিকারী রাজ-ইচ্ছা বুঝে তৎক্ষণাৎ বশিষ্ঠ মুনিকে আসরে নামালেন, যদিও বশিষ্ঠ মুনির সে সময় আসবার কোন কারণ ছিল না। রাজা বশিষ্ঠকে দেখে আরও মুগ্ধ হলেন এবং হুকুম করলেন 'অউর মুনি লে আও। তখনি আর এক জনকে পাকা দাড়ি পরিয়ে মুনি সাজিয়ে আনা হ'ল। রাজা তখন আসরে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে বসেছেন এবং হুকুম দিচ্ছেন—'অউর মুনি লে আও। যাত্রার দলে যে কয়টা পাকা ড াঁসা দাড়ি ছিল ফুরিয়ে গেল, তখনও রাজ মুগ্ধ হয়ে বলছেন 'অউর মুনি লে আও'। শেষে রাজবাড়ীর গুদাম থেকে শণ পাট বার করে তারি সাহায্যে মুনি সাজানো আরম্ভ হ'ল, এবং ডজন কয়েক মুনি যখন সারবন্দী হ'যে আসরে দাঁড়াল, তখন অধিকারী শাল বখ্‌শিস পেলেন। মশাই, সেই ইতিহাসই চোখের উপর পুনরাবৃত্ত হচ্ছে।"

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির কথায় আর একটা দৃষ্টান্ত মনে আসছে। শোনা যায়, দিল্লীর খেয়ালী সম্রাট্ মুহম্মদ বিন তোগলক্ তিন বার দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং প্রতিবারই হুকুমজারি হয়েছিল সমস্ত নাগরিকদের তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে। কাশিমবাজারের সাহেবটিও প্রথমে তাঁর রাজধানী কাশিমবাজার থেকে বহরমপুরে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার তাকে কলকাতায় টেনে নিয়ে যান। তিনিও প্রত্যেক বার হুকুম দিয়েছেন, চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজ-পত্তর এবং আমলাবর্গ সকলে তাঁরই সঙ্গে স্থানান্তরিত হবে। আবার এমন ব্যবস্থাও করতে হবে, যাতে স্থানান্তর-করণের সময় আমলাদের একটি দিনও আফিস কামাই না হয়, অর্থাৎ শনিবারের দিন যে টেবিল-চেয়ারে ব'সে সাহেব ও আমলাবর্গ বহরমপুরে চাকরি করবেন সোমবারে ঠিক সেই-সেই চেয়ার-টেবিলে তাঁরা কলকাতায় যথারীতি অফিস করবেন। এর ভার প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারের উপর। কাশিমবাজারে মহারাজার সদর-অফিস এক বিরাট

ব্যাপার। সুতরাং বানপ্রস্থী মহারাজা প্রত্যেক বারই নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। চেয়ার-টেবিল-কাগজের পাহাড়-প্রমাণ স্তূপ, সপরিবার আমলাদের ঠেলাঠেলি ভিড়, বর্ষার অবিশ্রাম বারিবর্ষণ ইত্যাদিতে মিলে সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কিন্তু জবরদস্ত সাহেবের এমনই প্রতাপ ও দক্ষতা যে প্রকৃতই শনিবারের অফিস বহরমপুরে সেরে সোমবারের অফিস কলকাতায় বসেছিল। দেশ থেকে সাহেব তাড়িয়ে ভাল কাজ হয়নি।

ক্রমে মহারাজ বিরক্ত হয়ে এই প্রচণ্ড সাহেবটিকে সরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কণ্টক তুলতে কণ্টক চাই. সাহেব তাড়াতে সাহেবেরই প্রয়োজন।

নানা কৌশলে মহারাজা এস্টেট দিলেন কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্‌এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু কি আশ্চর্য, এবারও যে সাহেবটি কর্ণধার হয়ে এলেন তিনি হাল হাতে করেই বললেন, ক্লাইভ স্ট্রীট থেকে আফিস অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। নিজেই চৌরঙ্গী অঞ্চলে এক বাড়ী ভাড়া করলেন—যার উপরিতলে থাকবেন স্বয়ং সপরিবারে, আর নিম্নতলে বসবে অফিস। নিজের সুবিধা অনুযায়ী, সাহেব কারও সঙ্গে পরামর্শ না ক'রেই বাড়ী নির্বাচন কোরে রেখেছেন, এখন তাঁর ইঞ্জিনিয়ারকে করতে হবে তারই মধ্যে সকলের স্থান-সংকুলান। অনেক মাপ-জোখ হিসেব কোরে যতীন বললে—কোন উপায়েই এ-বাড়ীর নিম্নতলে সমস্ত আমলার বসবার স্থান করা যাচ্ছে না, উপরতলের কিছুটা না নিলে অন্তত কুড়িটি লোকের স্থানাভাব ঘটছে। সাহেব অত্যন্ত সংক্ষেপে জবাব দিলেন—ঐ কুড়ি জন আমলাকে বরখাস্ত করে দিলেই হবে। যতীন বললে—সাহেব, আর একবার মেপে দেখি। তার পর ভগ্নপ্রায় আস্তাবল মেরামত করিয়ে, বাথরুমগুলির কমোড ইউরিন্যাল সরিয়ে, বারান্দায় পর্দা টাঙিয়ে. কোন রকমে ঐ কুড়ি জনের জায়গাও হ'ল। এ সাহেব রাজত্ব করলেন প্রায় পাঁচ বৎসর। এঁরই রাজত্ব কালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র দেহরক্ষা করেন।

তার পর বাঙ্গালী সাহেবের পালা। মহারাজার ঋণ শোধ না হ'য়ে ক্রমেই যেন বেড়ে যাচ্ছিল। সুতরাং বাঙ্গালী সাহেবদের বেতন খাঁটি সাহেবদের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এই রকম নামতে লাগল। এঁরা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত পাকা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাহেব হ'লেও বিশিষ্ট বাঙ্গালী ভদ্রলোক। যিনি যখন এসেছেন তিনিই বলেছেন পূর্বসূরিগণের

দোষেই এষ্টেট ঋণমুক্ত হয়নি, আমার আমলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিন্তু ক্রমেই সব বেঠিক হ'তে লাগল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ১৯৪২ সালে জাপানীরা ভাবছিল কলকাতায় বোমা ফেলব কি না। বোমা তখনও পড়েনি, কিন্তু কলকাতা প্রায় জনশূন্য হ'য়ে গেল। সেই সময় রাজধানী আবার কলকাতা থেকে বহরমপুরে ফিরে এল। আবার সেই আমলাদের সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার টেবিল আলমারী কাগজের বস্তা সচল হ'য়ে উঠল। সেই হুড়োহুড়ি, বিশৃঙ্খলা, অর্থের শ্রাদ্ধ। দীর্ঘ ১৩ বৎসর কলকাতায় কাটিয়ে যতীনও ফিরে এল বহরমপুরে।

কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস্ ঋণমুক্তির কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না। দাঁড়ি-মাঝি মিলে যতই মারে টান্ হেঁইয়ো, ঋণভারে তরণী ততই যেন ভরাডুবির দিকে এগিয়ে যায়। শেষে, ১৯৫৪ সালে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁর বহুমূল্য কয়লা খনির অংশবিশেষ বিক্রয় কোরে নিজেকে ঋণমুক্ত করলেন, এবং জমিদারীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন।

১৯২৩ থেকে ১৯৫০; এই দীর্ঘকাল নানা বিপর্যয়ের মধ্যে যতীন কাশিমবাজার এষ্টেটেই চাকরি কোরেছে। সেই সূত্রে তাকে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অনেক স্থানে পরিভ্রমণ করতে হ'য়েছে। তার কর্মজীবনে যে-সব দুষ্টগ্রহের দৃষ্টি পড়েছিল, যে কারণেই হোক্ তারা কেউ মারাত্মক হয়নি; যতীনও তাদের ভ্রূকুটি-কুটিলকটাক্ষ এড়িয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা লিখেছে, চরকাও কেটেছে। "মরীচিকা"র পরের সমস্ত কবিতাই তার কাশিমবাজারের চাকরির সময় লেখা। সে খবর মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ব্যতীত অপর কেহই বড় একটা রাখতেন না। কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পরই যতীন আমায় তার নতুন কবিতা শুনিয়ে দিল ঃ—

ইট কাঠ চুণ বালি আনাইয়া গাড়ী গাড়ী
সারাটা জীবন শুধু গাঁথিনু পরের বাড়ী।
কত দুশ্চিন্তাই ঘটাতে বাসের সুখ,
আলো হাওয়া জল ড্রেন,—পাছে কোন হয় চুক্।
সে সব বাড়ীতে মোর কোন অধিকার নাই,
পথে পথে খুঁজি আজ মাথা গুঁজিবার ঠাঁই।

ছন্দ অর্থ আর ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বাছি.'
সকলই পরের তরে, কবিতা যা গাঁথিয়াছি।
অশ্রু-সাগর সেচি' অহেতুক কৌতুকে
গাঁথিয়া গাঁথিয়া মালা দুলায়েছি বুকে বুকে।
হায় রে, আমার বলি সে-বুক সে-মালা কোথা,
যার পরশনে মোর জুড়াবে বুকের ব্যথা?

বরাত সঙ্গে চলে, কিছু নাই বলিবার,
মিথ্যে হইনু কবি, মিছে ইঞ্জিনিয়ার।

এই ইঞ্জিনিয়ার-কবির, বা লোহার ফুলদানির, কর্ম্মজীবনের কিছু পরিচয় দিলাম; কাব্যপরিচয় দেবে তার কবিতা। তবে আমি জানি, এই পরিচয়ও খাঁটি সত্য হবে না। তার অধিকাংশ কবিতার পিছনে একটি ছোট্ট সূচের ইতিহাস আছে; সেই সূচটাই আসল সত্য, সঙ্গে সঙ্গে যে সব সূতো ঘোরাফেরা করেছে তারাই যতীনকে মিথ্যা কবি-খ্যাতি দিতে বসেছে। এদিক দিয়ে তার বরাত ভাল। আমার এমনও মনে হয়, যতীনের বাল্যের ম্যালেরিয়াই কুইনাইন দ্বারা অবদমিত হ'য়ে পরিণত বয়সে কাব্যরূপ গ্রহণ করেছে। এদিক থেকে দেখলে তার কবিতার প্রধান উৎসটি হয়ত ধরা পড়তে পারে।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	২৩	মন-কবি	মন-কবি রে ।
১০৮		বাইশে শ্রাবন, ১৩৪৮	বাইশে শ্রাবণ. ১৩৪৮
১৩১	১১	নির্মল	নির্মম
১৩১	১৮	মর্মর	মর্মের